ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা

ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

।। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে পুনঃ প্রকাশিত ।।

প্রথম সংস্করণ আগষ্ট, ১৯২২
দ্বিতীয় সংস্করণ জানুয়ারি, ১৯৪৪
তৃতীয় সংস্করণ জুলাই, ১৯৫৯

শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট
শ্রীমহানাম অঙ্গন, রঘুনাথপুর
ভি, আই, পি, রোড, কলিকাতা-৫৯

শ্রীমহানামব্রত কালচারাল এণ্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট কর্তৃক প্রকাশিত
এবং তারা প্রিন্টার্স. ২৬ নং কে, জি, বোস সরণী,
কলিকাতা-৮৫ হইতে মুদ্রিত।

শ্রীচরণ-মণ্ডল প্রমীলাবালা-মণ্ডল-
স্মারক বক্তৃতা মালা

প্রাক্-কথন

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্মারক বক্তৃতা দিতে মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ করে। এবারের 'শ্রীচরণ-মণ্ডল প্রমীলাবালা-মণ্ডল-স্মারক' বক্তৃতার আলোচ্য বিষয় 'ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক আলোচনা।'

ভারতীয় দর্শন কথাটা সাধারণতঃ ষড়্‌দর্শন অর্থেই ব্যবহৃত হয়। আমি সেই অর্থ ধরিয়াই পাঁচদিন আলোচনা করিয়াছি। সময়ের অল্পতা চিন্তা করিয়া আমি ইহা ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছি, কর্তৃপক্ষের মত নিয়া করি নাই। দোষযুক্ত হইয়া থাকিলে ক্ষমার্থী।

ব্যাপক অর্থে ভারতীয় দর্শন বলিতে অনেক দর্শন বুঝায়। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার অনেকগুলি দর্শনের কথা বলিয়াছেন। বৌদ্ধ দর্শন, জৈন দর্শন, ভারতীয় দর্শনের অপরিহার্য্য অঙ্গ। কাশ্মীরী শৈব দর্শনের ব্যাপকতাও বিশাল। তন্ত্রদর্শনের ঐতিহ্যও বিরাট।

বর্ত্তমানকালে পণ্ডিতপ্রবর মহামহোপাধ্যায় পঞ্চানন তর্করত্ন শাক্তদর্শন নামে তন্ত্রদর্শনের খানিকটা রূপায়ণ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের 'তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত' (দুই খণ্ড), তন্ত্রের উপরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁহার 'অখণ্ড মহাযোগ' বইখানি এক যুগান্তকারী দর্শনের ইঙ্গিতবহ। সমসাময়িককালে শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনও এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। সকল দার্শনিক চিন্তাধারার প্রতি সুবিচার করিতে অন্ততঃ মাসাধিক অধিবেশন প্রয়োজন, পাঁচ ছয়দিনে সম্ভব

নহে। সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার রামানুজ-দর্শন ও ভাগবত দর্শন বা বৈষ্ণব-দর্শনকে আলাদা করিয়াছেন। আমি ঐসকল বেদান্ত দর্শনের অন্তর্গত ধরিয়া লইয়াছি।

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার সায়ণ-মাধবের সংগৃহীত মতবাদ ষোড়শটি। ইহার পরিগণনা ক্রমানুসারে করা যাইতেছে। (১) চার্বাক দর্শন, (২) বৌদ্ধ দর্শন, (৩) আর্হত দর্শন, (৪) রামানুজ দর্শন, (৫) পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন, (৬) নকুলীশ-পাশুপত-দর্শন (৭) শৈব দর্শন, (৮) প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন, (৯) রসেশ্বর দর্শন, (১০) ঔলূক্য (বৈশেষিক) দর্শন, (১১) অক্ষপাদ (গৌতম) দর্শন, (১২) জৈমিনীয় দর্শন (পূর্ব্ব-মীমাংসা), (১৩) পাণিনি দর্শন, (১৪) সাংখ্য দর্শন, (১৫) পাতঞ্জল দর্শন, (১৬) শাঙ্কর দর্শন (উত্তর মীমাংসা)।

এই ষোলটির প্রথমটি চার্ব্বাক দর্শন ও সর্ব্বশেষটি শাঙ্কর দর্শন। এই শাঙ্কর দর্শন বা বেদান্ত দর্শনকে সায়ণ-মাধব বলিয়াছেন "সকলদর্শনশিরোঽলংকাররত্নম্"।

ভারতীয় দর্শন একসময় জীবন্ত ছিল। এখন উহা অর্দ্ধমৃত। মতবাদই দর্শন নহে। উহা দার্শনিকের জীবনমধ্যে নিয়ত প্রাণবস্তু। একদিন তাই ছিল। সেই দিন জাতীয় জীবনে আর আসিবে কিনা—কে বলিবে ?

আশ্রব—মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতিক্রমে প্রকাশিত হইল।

সূচীপত্র

জয় জগদ্বন্ধু

ষড়্‌দর্শন

[তুলনামূলক আলোচনা]

সুপ্রাচীনকাল হইতে আর্য্য জাতির জীবনযাত্রার ভিত্তি ছিল বেদ। বেদ অপৌরুষেয়, কোন মানব কর্ত্তৃক রচিত নহে। বেদ অনাদি, ইহার কোন আরম্ভ নাই। ইহা কোনও কালে পরিবর্ত্তিত হয় না। বেদ সত্যপ্রতিষ্ঠ, স্বতঃপ্রমাণ। বেদ যাহা বলিয়াছে সকলই সনাতন সত্য। বেদের উক্তি সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহ পোষণ করা অপরাধ। মনুষ্যরচিত নহে বলিয়া রচয়িতার চারি দোষ অর্থাৎ ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা (প্রতারণা করার ইচ্ছা), করণাপাটব (ইন্দ্রিয়ের অপটুতা) ইহাতে নাই।

সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া বেদের সিদ্ধান্ত ও নির্দ্দেশই ছিল আর্য্যজাতির জীবাতু। বেদ কঠিন সংস্কৃত ভাষায় লেখা। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কাহারও বেদ চর্চ্চায় অধিকার ছিল না। ব্রাহ্মণরাই ছিলেন বেদের পাঠক ও ব্যাখ্যাতা। ব্রাহ্মণ যাহা বেদের তাৎপর্য্য বলিয়া বর্ণনা করিবেন, অপর তিনবর্ণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য, শূদ্র, তাহা অবনত শিরে মানিয়া চলিবেন। অবশ্য "স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই শ্রুতিবাক্যে ত্রিবর্ণেরই বেদ অধ্যয়নের বিধান আছে, কিন্তু এই ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব ছিল ব্রাহ্মণেরই ব্যাপক।

বেদশাস্ত্রের এই সুদৃঢ় ভিত্তির উপর এক মরণতুল্য আঘাত হানিল সর্ব্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম। বৌদ্ধগণ বেদের নিত্যত্ব অনাদিত্ব

অপৌরুষেয়ত্ব সকলই অস্বীকার (challenge) করিল। বৌদ্ধমতে, কোন প্রাচীন কালের ঐতিহ্যকে অন্ধভাবে মানিয়া সত্যের সন্ধান কস্মিন্‌কালেও পাওয়া যাইবে না। সত্যকে জানিতে হইবে জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা—যুক্তিতর্কবিচারের মাধ্যমে।

বেদের চাতুর্বর্ণ্য-ভেদ, ব্রাহ্মণের প্রাধান্য, যজ্ঞাদি নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য, আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব—ইহার প্রত্যেকটির বিরুদ্ধে বৌদ্ধমত সোচ্চার হইয়া উঠিল। মানুষের জীবনে জরা, ব্যাধি মৃত্যু আছে। তাহা অব্যভিচারে দুঃখ আনয়ন করে। এ সব অনতিক্রম্যও বটে। এই সকলের কবল হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইবে—বেদ মানিয়া নহে। এই সকল দূর করার উপায় নৈতিক জীবনযাপন, কাহাকেও (ইতর প্রাণীকে পর্য্যন্ত) হিংসা না করা, সর্ব্বজীবে সমভাবে ভালবাসা, চুরি মিথ্যা আচরণ হইতে বিরত থাকা, আহারে-বিহারে শুদ্ধ সংযমী হওয়া। শান্তির এই-ই পথ।

বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেশগুলি দেওয়া হইত তৎকালীন সকলের মাতৃভাষায়। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের সংস্কৃত ভাষা পণ্ডিত সমাজেই সীমাবদ্ধ থাকিত। লক্ষ লক্ষ নরনারী বৌদ্ধধর্ম্মের শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় খুঁজিল। বৌদ্ধধর্ম্মের সহজ সরল শিক্ষা সকলেই অনায়াসে গ্রহণ করিতে উন্মুখ হইল। দুর্ব্বোধ বৈদিক আধ্যাত্মিক ভিত্তি হইতে সরিয়া গিয়া মানবসমাজ বৌদ্ধধর্ম্মের সুখবোধ্য নীতিকথার ভিত্তিতে স্থিত হইল। বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয় অভিযান এক সহস্র বৎসর সগৌরবে জাতির জীবন পথ আলোড়িত করিয়া

বৈদিক মার্গকে ক্ষীণপ্রভ করিয়া বিরাজমান রহিল। ইহার মধ্যে প্রায় তিনশত বৎসর—বুদ্ধের আবির্ভাব হইতে সম্রাট্ অশোকের চার পর্য্যন্ত—বৌদ্ধধর্ম্মের 'স্বর্ণযুগ'। এই যুগে বৌদ্ধধর্ম্মের আলোক-বর্ত্তিকা শুধু ভারতে নহে, সমগ্র এশিয়ার সর্ব্বোচ্চে সমাসীন রহিল।

যে ধর্ম্মের মূলে প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বীকৃতি থাকে না, তাহা অল্পদিনের মধ্যেই বহুমতে বিভক্ত হইয়া যায়। একজন পণ্ডিত বিচার তর্ক দ্বারা যাহা স্থাপন করেন তদপেক্ষা অধিক সূক্ষ্ম বিচারক্ষম ব্যক্তি তাহাকে খণ্ডন করিয়া অন্য মত স্থাপন করেন—

যত্নেনানুমিতোঽপ্যর্থঃ কুশলৈরনুমাতৃভিঃ।
অভিযুক্ততরৈরন্যৈ রন্যথৈবোপপাদ্যতে॥

এইজন্য বৌদ্ধধর্ম্ম অল্পকাল মধ্যেই সৌত্রান্তিক বৈভাষিক যোগাচার ও মাধ্যমিক এই চারি ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িল। সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং, দুঃখং দুঃখং, স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং, শূন্যং শূন্যম্—এই হইল বৌদ্ধধর্ম্মের দার্শনিকতার ধ্রুবপদ। ক্ষণিক-সর্ব্বাস্তিত্ববাদ স্থূলতম হইতে সর্ব্ব-শূন্যবাদ সূক্ষ্মতমে আরোহণ করিল—'ভিক্ষুপাদপ্রসারণ-ন্যায়ে।' বুদ্ধদেবের শুদ্ধ সরল নীতিবাদ, দার্শনিকতার বেড়াজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল।

অপর দিকে বৈদিক ধর্ম্মের সনাতন ভিত্তি উপেক্ষিত হওয়ায় আর্য্যধর্ম্মের মনীষিগণ দিশাহারা হইলেন। বৈদিক ধর্ম্ম যে সত্য ও শাশ্বত এ বিষয়ে তাঁহাদের অন্তরে বিন্দুমাত্রও সংশয় ছিল না। সুতরাং বৈদিক সনাতন ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন হিন্দু দার্শনিকগণ। তাঁহারা স্থির করিলেন

সনাতন ধর্ম্মকে পুনরায় সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—যুক্তিতর্ক বিচার ও অন্যমতের খণ্ডনের ভিত্তিতে। শুষ্ক তর্কের ফল শূন্য। অতএব সকল প্রকার বিচার তর্ক সর্ব্বদাই বেদানুগ রহিবে। ফলে, বেদভিত্তিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-তর্কের নব জাগরণ হইল। বেদ যাহা সত্য বলিয়া অনাদিকাল হইতে ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা বিচার-যুক্তি দ্বারা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার প্রবল প্রচেষ্টা দেখা দিল চিন্তা-নায়কদের মধ্যে। এই নব জাগরণের ফলেই ষড়্-দর্শনের উৎপত্তি। বস্তুতঃ বীজরূপে ঐ চিন্তা বহু শতাব্দী ধরিয়া চলিতেছিল—তাহা সূত্র আকারে এবং তদপেক্ষা মূল্যবান্ ভাষ্যাদি আকারে রূপ পাইল ক্রমে ক্রমে ঐতিহাসিক ধারায়।

বৈদিক শাস্ত্রের প্রধানতঃ দুই ভাগ, সংহিতা ও ব্রাহ্মণ। সংহিতা অংশ যজ্ঞক্রিয়া-প্রধান, ইহার অপর নাম কর্ম্মকাণ্ড। ব্রাহ্মণের একাংশ উপনিষদ্। উপনিষদে ব্রহ্মানুধ্যান মুখ্য। ইহার অপর নাম জ্ঞানকাণ্ড বা ব্রহ্মবিদ্যা। বেদ-বাক্যে নিত্যত্ব, যজ্ঞতত্ত্ব, যজ্ঞক্রিয়া, তৎপ্রণালী ও ফল এই সকল যুক্তিতর্ক বিচার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে স্থাপনের প্রয়াসী হইল পূর্ব্ব মীমাংসা দর্শন। ইহাতে প্রধানতঃ নিত্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞাদিকর্ম্মের পদ্ধতি ও ফলশ্রুতি সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ঋষিবাক্যে বিদ্বদনুভূতিতে প্রকটিত ব্রহ্মতত্ত্ববিদ্যাকে যুক্তিতর্ক ও বিচার দ্বারা খণ্ডনমণ্ডনের মাধ্যমে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার দায়িত্ব লইলেন উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্ত দর্শন। বৈদিক শাশ্বত সত্যকে বিচার দ্বারা সুষ্ঠুভাবে স্থাপন ও বিরুদ্ধ মতকে সম্যক্ প্রদর্শন পূর্ব্বক নিরসন—এই দুই কার্য্য সদাই বিচার ও বিধিবদ্ধ

যুক্তিতর্কের প্রয়োজন। এই বিচার-তর্কেরও একটি সর্ব্বজন-সম্মত নীতি আছে, প্রণালী আছে, প্রমাণ-প্রদর্শন ও সূক্ষ্ম নীতির অনুসরণ আছে, পরমতের বিতণ্ডামূলক কূট তর্ককে সুষ্ঠুভাবে নিরাস করিবার উপায় আছে। এই সকল বিষয় লইয়া আলোচনা গবেষণা করিবার জন্য আবশ্যক হইল বিরাট ন্যায়শাস্ত্রের। এই শাস্ত্রের অন্য নাম আন্বীক্ষিকী। অনু ঈক্ষণ, সূক্ষ্মভাবে গভীরভাবে কোন কিছু দেখা (investigation) যাহাতে আছে তাহার বৈদিক নাম আন্বীক্ষিকী। তাহারই পরবর্ত্তী নাম ন্যায়দর্শন। এই দর্শনকে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রদীপ বলা হইয়াছে ('প্রদীপঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাম্'—কৌটিল্য, অর্থশাস্ত্র)।

বিশ্বের সকলই শূন্য। যাহা কিছু আছে সকলই ক্ষণিক বিজ্ঞান মাত্র (idealism)। বস্তু-সৎ কিছুই নাই। এই বিবিধ বৌদ্ধ মতের খণ্ডন করিয়া বস্তুবাদ-সংস্থাপনের কার্য্য করিয়াছে বৈশেষিক দর্শন। ন্যায় দর্শন তাহার প্রধান সহায়।

সকল বস্তুই স্বলক্ষণ—সর্ব্বং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণম্। কোন বস্তুর সঙ্গে কোন বস্তুর কোন যোগাযোগ নাই, কোন নীতিশৃঙ্খলা নাই। যার যার মতে সে আছে—বৌদ্ধদের এই ক্ষণিকবাদ ও স্বলক্ষণবাদ, বিজ্ঞানবাদ ও শূন্যবাদ খণ্ডন করিয়া একটি সুশৃঙ্খলিত বিশ্বসংসারের ধারণা স্থাপন করা সাংখ্যদর্শনের উদ্দেশ্য।

জগৎটা যে একটা শৃঙ্খলাহীন বস্তুসমষ্টি বা ভাবসমষ্টি নহে, ইহার প্রত্যেক বস্তুর সঙ্গে প্রত্যেক বস্তুর যে একটা নিবিড় যোগাযোগ আছে, ইহারা সকলেই যে এক মূল প্রকৃতির সন্তান,

প্রকৃতির পরিণাম হইতে যে এই নিখিল বিশ্বের ক্রমাভিব্যক্তি —এই তত্ত্ব স্থাপনে সাংখ্যের প্রয়াস।

বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ-লাভের প্রচেষ্টার মধ্যে অনেক গভীর সাধন রহস্য লুক্কায়িত আছে। কিন্তু তাহা বৈদিক সিদ্ধান্ত হইতে বিচ্যুত। বৈদিক তত্ত্বকে ভিত্তি করিয়া চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করতঃ ক্রমে সমাধিভূমিতে তুলিয়া লইবার প্রণালী লইয়া যোগদর্শনের আলোচনা। তত্ত্বগত ভেদ সাংখ্য-দর্শন হইতে যোগদর্শনে অল্পই।

ছয়খানি সূত্র-গ্রন্থের উপর ছয়টি দর্শন প্রতিষ্ঠিত। মীমাংসা-দর্শনের সূত্রকার জৈমিনি। উত্তর-মীমাংসা বা বেদান্তের সূত্রকার বাদরায়ণ। ন্যায়সূত্রকার গৌতম। বৈশেষিক-সূত্রকার কণাদ। সাংখ্য-সূত্রকার কপিল। যোগদর্শনের সূত্রকার পতঞ্জলি। ছয় জন ঋষি ষড়্দর্শনের আদি প্রবক্তা। তথাপি—সূত্রকারেরা ঐ দর্শনের যথার্থতঃ প্রণেতা বা সূত্রকর্ত্তা নহেন। সূত্রগুলি মনোনিবেশ সহকারে আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে সূত্ররূপে গ্রথিত হইবার পূর্ব্বে, দীর্ঘকালের—কয়েক শত বৎসরের চিন্তা ও মনন না থাকিলে ঐরূপ সুষ্ঠু সুশৃঙ্খলাপূর্ণ সূত্র প্রণয়ন সম্ভব নহে। সমাজ জীবনে চিন্তাশীলগণের অন্তরাকাশে এই সকল ভাবনা সুদীর্ঘকাল ভাসমান ছিল। তাহা কোন যোগ্য ব্যক্তি সংগ্রহ করিয়া সূত্ররূপে সংগ্রথন করিয়াছেন।

একটি মালা গ্রথনের পূর্ব্বে যেমন পুষ্পচয়ন অত্যাবশ্যক সেইরূপ একখানি সূত্রের মালা গাঁথিতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিক্ষিপ্ত মননের পুষ্পচয়ন প্রয়োজন হইয়াছে।

সূত্রগ্রন্থগুলি প্রায় সমসাময়িক মনে হয়। কারণ, সাংখ্যসূত্রে বেদান্তের খণ্ডন ও বেদান্ত-দর্শনে সাংখ্য মতের খণ্ডন পরিদৃষ্ট হয়। আবার ন্যায়সূত্রে বেদান্তের খণ্ডন ও বেদান্তসূত্রে ন্যায়ের খণ্ডন পাওয়া যায়। ইহাতে মনে হয় সকল দর্শনের মূল কথাগুলি দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্যাপকভাবে মননরাজ্যে বিক্ষিপ্ত ছিল। সূত্রকারগণ তাহার রূপায়ণ-কর্ত্তা মাত্র। অতঃপর সূত্রগুলি সংপ্রসারিত করিয়া পরমতখণ্ডনও যোজিত হইয়াছে। কারণ প্রবল পরমত খণ্ডন না করিয়া স্বমত সুস্থিত করা যায় না। ব্রহ্ম-সূত্রের ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর একথা স্বীকার করিয়াছেন।

মানব জাতির সাহিত্যে সূত্র-সাহিত্য একটি অভূতপূর্ব্ব বস্তু। ইহার অনুরূপ কিছু পৃথিবীর অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। বহু বিষয়কে অতি অল্পকথার মধ্যে প্রকাশ করাকে বলে সূত্ররূপে প্রকাশ। বহুবিষয়ক বহু কথাকে যখন মনে করিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল তখনই তাহা সূত্রাকারে প্রকাশ করিয়া কণ্ঠস্থ রাখিবার চেষ্টা দেখা দিল। সূত্রের লক্ষণ বলিয়াছেন ভামতীকার—

অল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্‌বিশ্বতোমুখম্।
অস্তোভমমবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥

সূত্র হইবে সংক্ষিপ্ত, সংশয়াবকাশ-রহিত, সারকথাযুক্ত, অসার অপ্রয়োজনীয় কথা বর্জ্জিত, ভ্রমপ্রমাদশূন্য, সর্ব্বপ্রকার দোষহীন। সূত্রের একটি অপ্রয়োজনীয় অক্ষর কমাইতে পারিলে সূত্রকারদের পুত্রোৎসবের আনন্দ হইত। "অর্দ্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবং মন্যতে।"

সূত্রগ্রন্থগুলি এই কারণে অতি সংক্ষিপ্ত হওয়ায় সূত্রের

অর্থবোধ অতি কঠিন হইয়া উঠিল। তখন প্রয়োজন দেখা দিল সূত্রের ব্যাখ্যা বা ভাষ্যের। গৌতমের ন্যায়দর্শনের উপর আছে বাৎস্যায়নের ভাষ্য। কণাদের বৈশেষিক দর্শনের উপরে আছে প্রশস্তপাদের ভাষ্য। যোগসূত্রের উপর আছে ব্যাসের ভাষ্য। সাংখ্যকারিকার উপর আছে বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী। মীমাংসাসূত্রের উপর আছে শবর স্বামীর ভাষ্য। বেদান্ত দর্শনের বহু ভাষ্য। তন্মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ও রামানুজাচার্য্যের ভাষ্য প্রসিদ্ধ। ভাষ্যের আবার অনুভাষ্য আছে। ক্রমে ক্রমে ভাষ্য অনুভাষ্যে ও বহু প্রকরণ-গ্রন্থের আলোচনায় মূল সূত্রার্থ জটিল হইতে জটিলতর হইয়া গিয়াছে। ব্যাখ্যাভেদে কদাচিৎ বস্তু-ভেদও ঘটিয়াছে। বিশেষতঃ বেদন্ত দর্শনে।

মাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থে দেখা যায় ষড়্দর্শন ছাড়া আরও অনেকগুলি দর্শন ছিল। সর্ব্বশুদ্ধ তিনি ষোলটি দর্শনের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে চার্ব্বাক দর্শন প্রথম। এই মতের খণ্ডন বহু দর্শন সূত্রে দেখা যায়। তাই মনে হয়, এই মত এক সময় অতি প্রবল-যুক্তিসংবলিত ও সাধারণ লোক মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাই হয়ত ইহার নামান্তর লোকায়ত। এই মতের সূত্রাকারে নিবদ্ধ কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। চার্ব্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষ ভিন্ন প্রমাণ মানা হয় না। দৃঢ় যুক্তিবলে ইহারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, ব্যাপ্তিগ্রহ কখনও হইতে পারে না। তাই অনুমান কখনই প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না।

চার্ব্বাকের পরে বৌদ্ধ, জৈন, রামানুজ, পাশুপতাদি শৈব দর্শন

কয়েকখানি, বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব্বমীমাংসা, পাণিনি ব্যাকরণ, সাংখ্য, যোগ এবং সর্ব্বশেষ বেদান্ত।

এই কয়টির মধ্যে ষড়্দর্শন নামে প্রসিদ্ধ ছয়টি দর্শন হইল— বৈশেষিক-ন্যায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল (যোগ), পূর্বমীমাংসা-উত্তর-মীমাংসা (বেদান্ত)। এতদ্ভিন্ন বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনও বিশালায়তন গ্রন্থসম্ভারে সমৃদ্ধ। চার্বাকের মতের কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না। পাণিনি ব্যাকরণ সুপ্রসিদ্ধ। কয়েকটি শৈব দর্শনও ক্ষীণ অবস্থায় দৃশ্যমান হয়। রামানুজ-দর্শন বেদান্তেরই একটি শাখা বলা চলে। বেদান্ত বলিতে শঙ্করসম্মত ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা বুঝা গেলেও রামানুজ শঙ্করের সুযোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী। আমরা রামানুজ ও তদনুগামীদের মতের কিঞ্চিৎ উল্লেখ যথাস্থানে করিয়াছি। ইহার অনেকগুলি কালক্রমে প্রায় লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল ষড়্দর্শনই বাঁচিয়া আছে। এইজন্য প্রাচীন দার্শনিকগণ মনে করিতেন, স্বাধীনভাবে কোন দার্শনিক আলোচনা করিলে সুধীসমাজে তাহা গৃহীত ও স্থায়ী হইবে না। যাহা কিছু বক্তব্য, ষড়্দর্শনের টীকা টিপ্পনীর মধ্য দিয়াই প্রকাশ করিতে হইবে। এই হেতু ভারতীয় শ্রেষ্ঠ দার্শনিকরা প্রায় সকলেই টীকাকার। ক্যান্ট হেগেল যে অর্থে দার্শনিক, সেই অর্থে শঙ্কর রামানুজ দার্শনিক নহেন। পাশ্চাত্ত্য পরিভাষায় তাঁহারা Pholosopher নহেন, Scholar মাত্র। তাঁহাদের কার্য্যের নাম দার্শনিকতা নহে, Scholasticism। এই টীকা-ভাষ্যকারগণের তুল্য চিন্তাশীল দার্শনিক কিন্তু অতি অল্পই জন্মিয়াছেন।

কতিপয় বিষয়ে ষড়্দর্শনের একান্ত ভাবেই ঐক্য আছে।

কতিপয় বিষয়ে মতভিন্নতা আছে, বিরুদ্ধতাও আছে। পণ্ডিত বিজ্ঞানভিক্ষু প্রায় সকল দর্শনের উপরেই ব্যাখ্যা ভাষ্য লিখিয়াছেন। মহামতি বাচস্পতি মিশ্রও প্রায় সব দর্শনেরই অমূল্য টীকাগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। বেদান্তে ভামতী, সাংখ্যে সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী, ন্যায়ে ন্যায়বার্তিক-তাৎপর্য্য-টীকা, যোগে তত্ত্ববৈশারদী। অধ্যাপক মোক্ষমূলার (Max Muller) বলিয়াছেন—

"The longer I have studied the various systems of Indian Philosophy, the more have I become impressed with the truth of the view taken by Vijnanabhikshu and others that there is behind the variety of six systems a common trend what may be called national or popular Philosophy, a large Manasa Lake of Philosophical thought and language far away in the distant North and in the distant past from which each thinker was allowed to draw for his own purpose."

"বিভিন্ন দর্শনগুলি যতই পড়া যায় ততই আমার মনে হয় বিজ্ঞানভিক্ষুপ্রমুখ দার্শনিকদের মত সত্য। সাংখ্যপ্রবচনের ভাষ্যের উপক্রমণিকায় ভিক্ষুজী বলিয়াছেন যে ছয়টি দর্শনের মূলে রহিয়াছে একটি জাতীয় দার্শনিক মতবাদ। ইহাতে দার্শনিক চিন্তাধারার একটি মানস সরোবর রহিয়াছে। এটি সুদূর অতীতে নিহিত এই উৎস হইতে সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।" (ভাবানুবাদ)

বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যের উপক্রমণিকায় বলিয়াছেন—লোকায়ত চার্বাক মতের এবং বিজ্ঞান বা শূন্যবাদী বৌদ্ধের মতের খণ্ডনার্থ ন্যায়-বৈশেষিক আচার্য্যগণ অগ্রসর হন। ইঁহারা দেহাতিরিক্ত আত্মাকে স্থাপন করেন। আনুষঙ্গিকভাবে ইঁহারা পরকাল পাপপুণ্য অদৃষ্ট প্রভৃতিও স্থাপন করেন। তৎপরে সূক্ষ্মতর দৃষ্টি লইয়া আসিলেন সাংখ্যাচার্য্যগণ। তাঁহারা স্থাপন করিলেন নির্গুণ শুদ্ধ আত্মা (ন্যায় বৈশেষিক আত্মাকে সগুণ বলেন)। সর্ব্বশেষে আসিলেন বেদান্তদর্শন। তাঁহারা প্রকৃত সত্য—উপনিষদ্ হইতে আহৃত আত্মতত্ত্ব বিবৃত করিলেন। এই জন্যই অপরের অপেক্ষায় তাঁহাদিগকে 'কৃৎস্নবিদ্' বলিয়া গীতায় বলা হইয়াছে—"তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ" (গীতা ৩।১৯)। নিজ নিজ ক্ষেত্রে সকলেরই উপযোগিতা আছে।

পণ্ডিতপ্রবর চন্দ্রকান্ত বিদ্যালঙ্কার বলেন—ষড়্‌দর্শনের প্রত্যেকটিই বেদানুগ। ইহাতে ইহা বুঝা যায়—একটা বৈদিক সাহিত্য হইতে সকলেই তাঁহাদের দার্শনিক উপকরণ আহরণ করিয়াছেন। সকলেই প্রাচীন ঐতিহ্যের দোহাই দিয়াছেন যাহাতে বৈদিক সিদ্ধান্তগুলি পুনরার সংস্থাপিত হয়। বৌদ্ধ দর্শনের প্লাবনে যাহা ভাসিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল তাহা যে তুচ্ছ বস্তু নহে, অতি মূল্যবান্ সম্পদ্—ইহা প্রদর্শন করিবার চেষ্টা সকলের মধ্যেই অল্পবিস্তর পরিদৃষ্ট হয়।

কতকগুলি দার্শনিক পরিভাষা প্রত্যেক দর্শনই ব্যবহার করিয়াছেন। যথা—জীব আত্মা মন বুদ্ধি মায়া পুরুষ প্রভৃতি। যদিও সকল দর্শনের প্রায় একই পরিভাষা—তবু সর্ব্বত্র

তাহাদের তাৎপর্য্য এক নহে। বেদ সত্য ইহা মানিয়াও অনেকেই নিজ নিজ মত, যুক্তি বিচার দ্বারাও স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন রূপে করিয়াছেন। ভুল বা মিথ্যাজ্ঞান কি, তাহা জানিবার চেষ্টা সকলেরই আছে। শুক্তি যে রজতরূপে প্রকাশিত হয় ভ্রান্তি-বশে, সেই ভ্রমের স্বরূপ সম্বন্ধে পাঁচটি মতবাদ দেখা যায়—

আত্মখ্যাতিরসৎখ্যাতি রখ্যাতিঃ খ্যাতিরন্যথা।
তথানির্বচনখ্যাতি রিত্যেতৎ খ্যাতিপঞ্চকম্॥

আত্মখ্যাতি, অসৎখ্যাতি, অখ্যাতি, অন্যথাখ্যাতি, অনির্বচনীয়-খ্যাতি। মিথ্যাজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা মত থাকিলেও তাহা দূর করিয়া সত্য জ্ঞান লাভ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে সকলেই একমত। সত্য জ্ঞান, ভ্রমপ্রমাদ-বর্জ্জিত জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি, এই বিষয় লইয়া সকলেই আলোচনা করিয়াছেন। জ্ঞান আহরণের কতগুলি পন্থা আছে ইহা লইয়াও প্রত্যেকের বিভিন্ন ভাবের আলোচনা আছে।

দর্শন শাস্ত্রকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়—আস্তিক ও নাস্তিক। সাধারণতঃ আস্তিক বলিতে পরলোকে বিশ্বাসী ও নাস্তিক বলিতে পরলোকে বিশ্বাসহীন বুঝায়। কিন্তু ষড়্‌দর্শনে ঐ শব্দ দুইটি ঐ ঐ অর্থে প্রযুক্ত নহে। আস্তিক অর্থ যে বেদ মানে। নাস্তিক অর্থ যে বেদ মানে না, বেদ-নিন্দুক। মহর্ষি পাণিনির সূত্রটি এই—"অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ।" (পা. ৪. ৪. ৬০)

কাশিকাকার বলেন—

অস্তি পরলোক ইতি মতির্যস্য স আস্তিকঃ।
নাস্তি পরলোকঃ ইতি মতির্যস্য স নাস্তিকঃ॥

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনকে নাস্তিকদর্শন বলা হইয়াছে। যদিও সাংখ্য ও মীমাংসাদর্শনও ঈশ্বরতত্ত্ব মানেন নাই, তথাপি ইহারা বেদ মানিয়াছেন বলিয়া আস্তিক। সাংখ্য, সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মানেন নাই। কতিপয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যক্তিকে, সেশ্বর সাংখ্য ঈশ্বর বলিয়াছেন। পূর্ব-মীমাংসা, বেদের দেবতাতত্ত্ব মানিয়াছেন কিন্তু সর্বোপরি পরমেশ্বর মানেন নাই।

উপনিষদে নির্দেশ আছে—

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ—শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"

আত্মাকে শ্রুতিবাক্যের মধ্য দিয়া শ্রবণ করিতে হইবে। গুরূপদেশ ও শাস্ত্র আমাদের নিকট আত্মতত্ত্বের অস্তিত্ব অবগত করায়।

অতঃপর জাগে সেই আত্মার সম্বন্ধে কৌতূহল—তখন শাস্ত্রানুকূল যুক্তিদ্বারা সেই আত্মার মনন বা চিন্তা করিতে হয়। মননের পরে সর্বদাই সেই আত্মার ধ্যান করিতে হয়। তাই আত্ম-জ্ঞানের পন্থা এই তিনটি—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন (ধ্যান)।

ষড়্দর্শনের সকলেই বেদ মানিয়াছেন, একথার অর্থ ইহা নহে যে বেদের সকল সিদ্ধান্ত তাঁহারা সকলে স্বীকার করিয়াছেন। বেদ মানিয়াছেন অর্থ এই যে মানুষ ব্যক্তিগত বিচার বুঝি দ্বারা যাহা জানিতে পারে তদপেক্ষা উচ্চতর ভূমিকায় স্থিত মনীষীদের সমাধিলব্ধ অনুভূতি অধিকতর সত্য। ঋষির দিব্য অনুভূতি আমাদের সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ পরোক্ষ জ্ঞান অপেক্ষা

অধিকতর সত্য। বিদ্বদনুভূতি, যোগীর যোগজ অনুভূতি, উপেক্ষণীয় বা খণ্ডনীয় নহে। সুতরাং বেদবাক্য স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি জ্ঞানের পথ। ইহা স্বীকার করাই বেদকে মানা।

বৌদ্ধ মতবাদের এবং লোকায়ত বা চার্ব্বাক মতবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণায় ষড়্দর্শন সকলেই সমধর্মী। বৌদ্ধের "সর্বং ক্ষণিকং" এই ক্ষণিকবাদের বিরুদ্ধে একটি বাস্তব জগৎকে স্থাপন করিতে সকলেই একমত। একটি বাস্তব সত্যের ধারা অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে—ইহা শুধু কল্পনা নহে। বাস্তব জগতের (Objective World) মধ্যে একটা ছন্দ আছে, সৃষ্টি-স্থিতি-লয় আবার সৃষ্টি স্থিতি-লয়—অনাদিকাল ইহা চলিতেছে। এই ধারার আরম্ভ বা শেষ নাই। ইহার মূলে একটি অপরিবর্ত্তনীয় সত্তা আছে। তাহাকে কেহ বলেন প্রকৃতি, কেহ বলেন মায়া, কেহ বলেন পরমাণু, কেহ বলেন চৈতন্য। কিন্তু একটি মূল যে আছে তাহা ষড়্দর্শনে স্বীকৃত। বৌদ্ধ দর্শন এই মূলটি মানেন নাই।

ষড়্দর্শনে সর্বত্র জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত, কারণ ইহা বৈদিক সিদ্ধান্ত। জীবনের মধ্যে একটা চরম পরম বস্তুর প্রতি প্রধাবন আছে, তাহার নাম মুক্তি, মোক্ষ বা কৈবল্য। সেই অবস্থা লাভ না করা পর্য্যন্ত জন্মমৃত্যুর প্রবাহ মধ্যে মানুষ চলিতে থাকিবে।

জন্মের পর মৃত্যু, আবার জন্ম, আবার মৃত্যু, ইহাই সংসরণ বা সংসার। মৃত্যুই শেষ দশা নহে। একটি শান্ত অবস্থা প্রাপ্তিই চরম কথা। কাম, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ঘৃণাপূর্ণ এই জগৎ সংসার

কেবলই দুঃখতাপময়। সাধনা দ্বারা, কঠোর তপস্যা দ্বারা এই দুঃখ তাপের অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ নিষ্কৃতি লাভ করা যায়—এই বিষয়ে ষড়্দর্শনের সকলেই একমত। কোন উপায়ে এই লাভ হয়, সে সম্বন্ধে এক এক মুনির এক এক মত।

সত্য নির্দ্ধারণ করিতে ও স্বপক্ষ স্থাপন এবং পরমত খণ্ডন করিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রমাণের। প্রমা শব্দে বুঝায় প্রকৃষ্ট মা বা জ্ঞান। সেই জ্ঞানের যিনি জ্ঞাতা, তিনি প্রমাতা। যে বিষয়ক জ্ঞান-তাহা প্রমেয়। জ্ঞানের যাহা সাধন তাহাকে বলে প্রমাণ। যাহা যে বিষয়ে যথার্থ অনুভূতির কারণ বা সাধন তাহাই সেই বিষয়ে প্রমাণ। যেমন পর্বত বহ্নিমান্, ঐ জ্ঞান প্রমা (অনুমিতি)। এখানে পরামর্শ জ্ঞান, প্রমাণ বা প্রমার করণ। এই স্থলে, পর্বত বহ্নিব্যাপ্য ধূমবান্, এই জ্ঞান পরামর্শ। প্রমেয় বহ্নি, যাহা প্রমাণ দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে।

এই বিষয়ে সকল আচার্য্যই একমত। কিন্তু প্রমাণ কত প্রকার সে বিষয় আচার্য্যগণ একমত নহেন। ন্যায়শাস্ত্রে চারিটি প্রমাণ গৃহীত—"প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি"—গৌতম।

চার্বাক একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণবাদী। চার্বাক বলেন—দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই, এইজন্য দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। চৈতন্য-বিশিষ্ট দেহই আত্মা। কণাদ ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়-বিশেষ প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই প্রমাণদ্বয়বাদী। বৌদ্ধেরা অনুমান মানেন, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য মানেন না, এইজন্য শব্দ প্রমাণ স্বীকার করেন না। কণাদও বলেন, শব্দ প্রমাণের কার্য্য অনুমান দ্বারাই চলে। সাংখ্য দর্শন ও ন্যায়ৈকদেশী তিন প্রমাণ

স্বীকার করেন। তাঁহারা বলেন—উপমান প্রমাণের কার্য্য অনুমিতি দ্বারাই চলে।

গুরু প্রভাকর পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ চতুষ্টয় এবং তৎসহ 'অর্থাপত্তি' প্রমাণ স্বীকার করেন। কুমালির-ভট্ট সম্প্রদায় ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় উক্ত পঞ্চ প্রমাণ ও তৎসহ অভাব প্রমাণ মানেন। অভাব অর্থ, যোগ্যের অনুপলব্ধি। পৌরাণিক সম্প্রদায় উক্ত ষট্‌প্রমাণ এবং সম্ভব ও ঐতিহ্য এই অষ্ট প্রমাণ স্বীকার করেন। এ বিষয়ে আচার্য্য শঙ্করের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য মানসোল্লাস গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি, সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহ প্রভাকরঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥

অস্যার্থ—চার্ব্বাকরা একটি প্রমাণ (প্রত্যক্ষ) মানেন। কণাদ ও বৌদ্ধ মানেন দুইটি প্রত্যক্ষ ও অনুমান। সাংখ্য মানেন আরও একটি, প্রত্যক্ষ অনুমান আগম (শব্দ)। ন্যায়ের একাংশও তিনটি মানেন। কেহ বা আর অধিক একটি মানেন —প্রত্যক্ষ, অনুমান আগম, উপমান।

প্রভাকর মানেন আর একটি অর্থাপত্তি (মোট পাঁচটি)। কুমারিল ভট্ট ও বেদান্তীরা মানেন আর একটি—অভাব (অনুপলব্ধি)। পৌরাণিকগণ আরও দুইটি মানেন, মোট আটটি—

প্রত্যক্ষ, অনুমান, আগম, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব এবং ঐতিহ্য।

*আদি বক্তা কে জানা নাই, এরূপ পরম্পরাগত প্রবাদ বাক্য ঐতিহ্য। যেমন, এই বটে এক যক্ষ বাস করে।

অর্থাপত্তি—জীবিত দেবদত্ত গৃহে নাই। তাহা হইলে সে (অবশ্য) বাহিরে আছে।

সম্ভব—কাহারও সহস্র (মুদ্রা) থাকিলে, শত নিশ্চয়ই আছে (সহস্রের অভ্যন্তরে শত)।

অভাব—জলবর্ষণের অভাব দ্বারা বুঝা যায়, মেঘবায়ুর যাদৃশ সংযোগ প্রয়োজন তাদৃশ হয় নাই।

ন্যায়ৈকদেশী—অর্থে ভাসর্ব্বজ্ঞ সম্প্রদায়।

বৈশেষিক দর্শন

ন্যায় বৈশেষিকের নাম প্রায়শঃ একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। তথাপি মনে হয় ন্যায়দর্শন হইতে বৈশেষিকদর্শন প্রাচীন। ন্যায়দর্শনেব কোন প্রভাব বৈশেষিকে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ন্যায়সূত্রে বৈশেষিকের প্রভাব দৃষ্ট হয়। বাৎস্যায়নের ভাষ্য হইতে ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। তদ্‌ভিন্ন, ন্যায় দর্শনে জ্ঞানেব যে সূক্ষ্ম বিচাব আছে তাহার কোন আভাস বৈশেষিকে নাই। কণাদ পরবর্ত্তী হইলে গৌতমের বিচাবনৈপুণ্য তাঁহাব লেখাব মধ্যে বক্ষিত হইত।

কণাদ পদার্থ-সত্যতা বাদী। বৌদ্ধমতে পদার্থ অলীক, ক্ষণস্থাযী। কণাদ মতে পদার্থ বাস্তব। যদিও বৈশেষিকসূত্রে স্পষ্টভাষায় ক্ষণিকবাদেব খণ্ডন দৃষ্ট হয় না, তথাপি একথা বলা চলে যে বস্তুজাত যে ক্ষণিক বা অলীক নহে, ইহা স্থাপনের জন্যই কণাদেব পদার্থবাদ। কণাদ বস্তুবাদী কিন্তু জড়বাদী নহেন। জড়বাদীবা সকলেই আত্মাকে অস্বীকার কবেন। কণাদ কিন্তু আত্মাকে দৃঢভাবেই স্বীকৃতি দিযাছেন।

কণাদ মতে পদার্থ—দ্রব্য গুণ কর্ম সামান্য বিশেষ ও সমবায়। এই দর্শন প্রথম যখন রূপ পায় তখন ছয়টি পদার্থ ই ছিল। এই ছযটি ভাব পদার্থ। পববর্ত্তী কালে ক্রমে অভাব পদার্থটি যুক্ত হইয়াছে। অভাব-জ্ঞান, প্রতিযোগীব জ্ঞানের অধীন বলিয়া তাহার পৃথক্ সত্তা ইহারা মানেন নাই কিন্তু মুখে না বলিলেও 'কণ্ঠতঃ অনুক্তো অপি'—অভাব, বৈশেষিক-স্বীকৃত।

তাই বৈশেষিককে সপ্ত-পদার্থবাদী বলা হয়। উদয়নাচার্য বলেন, অভাব তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই তাহা নহে, ইহা প্রতিযোগীর জ্ঞানের অধীন বলিয়া পৃথক্ উক্ত হয় নাই। বৈশেষিক মতে দ্রব্য নয় প্রকার—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন। আত্মাকে কণাদ একটি দ্রব্য বলিয়া মানিয়াছেন—এইজন্য বলিয়াছি কণাদ ঋষি বস্তুবাদী হইলেও জড়বাদী নহেন। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে দুইটি প্রমাণ, আগম ও অনুমিতি। আগম অর্থে বেদ। বেদে আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত। এইজন্য আত্মা মানিতে হইবে। ইহা ছাড়া অনুমান প্রমাণ দ্বারাও আত্মার সত্তা স্থাপন করা যায়। আগম বৈশেষিক স্বীকৃত না হইলেও তাঁহারা বেদ মানেন।

আমাদের চেতনা বা চৈতন্য আছে। চৈতন্য যাহার ধর্ম্ম সেই আত্মা। চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম নহে। উহা ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্মও নহে। মনের ধর্ম্মও নহে। সুতরাং উহা আত্মারই ধর্ম্ম। দেহের ক্ষতস্থান যে শুকাইয়া যায় তাহাও আত্মার চৈতন্য আছে ইহা প্রমাণিত করে। সুখ, দুঃখ, রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছা, জ্ঞান এই গুণগুলি আত্মার। আত্মা না থাকিলে ইহারা কি করিয়া কোথায় থাকিত? আমরা যে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতে পারি তাহাও আত্মার অবস্থিতির জন্য। আত্মা ভিন্ন দেহ বা ইন্দ্রিয়গণ কেহই ইহা করিতে সক্ষম নহে। চৈতন্য আত্মার ধর্ম্ম, কিন্তু স্বরূপগত ধর্ম্ম নহে। চৈতন্য একটা আগন্তুক ধর্ম্ম। দেহ ও মনের সঙ্গে যুক্ত হইলে আত্মা চেতনা-বিশিষ্ট। আত্মা চেতনারূপ যন্ত্র দ্বারা নিজের ও অপরের বিষয় পরিজ্ঞাত হয়।

আত্মা এক নহে, বহু, ইহা কণাদের মত। গৌতমেরও একই মত। প্রত্যেক আত্মাই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। আত্মা একটি মাত্র হইলে একজনের কর্ম্মফল অপরের ভোগ করিতে হইত। আবার একজনের মুক্তিতে সকলের মুক্তি হইত। তাহা যখন হয় না, তখন বুঝিতে হইবে আত্মা বহু। আত্মার সংখ্যা অগণিত। প্রত্যেক আত্মার একটি বিশেষ আছে। কণাদ-মতে সকল নিত্য বস্তুতেই এই বিশেষের সত্তা আছে। মুক্ত আত্মা সকল বিদ্যমান থাকে তাহাদের স্ব স্ব বিশেষ লইয়া। বস্তুতঃ এই বিশেষ যে কিরকম বস্তু তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু উহা আছে বলিয়াই প্রত্যেকটি বস্তু নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য লইয়া চির বিরাজমান। এই বিশেষ শব্দ হইতেই বৈশেষিক দর্শনের নামকরণ। এই বিশেষ ব্যাবর্ত্তক হইয়াও স্বতোব্যাবৃত্ত। কণাদ ঋষির অপর নাম কণভুক্। সম্ভবতঃ ইনি পরমাণুবাদ স্থাপন করিয়াছেন এইজন্য এই নাম। পরমাণু, বস্তুর শেষ কণা। পরমাণু অসংখ্য। তাহাদের প্রত্যেকের বিশেষও অসংখ্য। আকাশে ব্যাবর্তকগুণ শব্দ আছে। আত্মাতে ব্যাবর্তকগুণ জ্ঞান আছে। তাই আত্মা ও আকাশে, বিশেষ নাই।

কণাদ শুধু প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি, এই দুইটি প্রমাণ স্বীকার করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় বৌদ্ধগণও প্রমাণদ্বয়বাদী। গৌতম শব্দ ও উপমান এই দুইটি অতিরিক্ত প্রমাণ মানেন। কণাদ বলেন, অনুমান দ্বারাই এই দুইটি প্রমাণের নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু গৌতম বলেন, ব্যাপ্তিবোধ ছাড়াই শব্দ ও উপমানের জ্ঞান হয়। তাই এই দুইটি অনুমানের অন্তর্গত নহে, পৃথক্ প্রমাণ।

ন্যায়-দর্শন

ন্যায়-দর্শনের বয়স অন্ততঃ দুই হাজার বৎসর। অর্থাৎ দুই হাজার বৎসর ধরিয়া ন্যায় শাস্ত্রের চর্চ্চা চলিতেছে। আনুঃ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকে লিখিত গৌতমের ন্যায়সূত্র হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর নব্যন্যায়ের জাগদীশী, গদাধরী, মাথুরী, অন্নম্ভট্টের তর্ক-সংগ্রহ, বিশ্বনাথের ন্যায়-সূত্রবৃত্তি পর্য্যন্ত ইহার বিস্তৃতি।

ন্যায়-সূত্র বৌদ্ধ-দর্শনের শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছে। এই দুইটি বাদের মূল কথা কি তাহাই বলিতেছি। বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত, বৃহৎ জগৎ (Macrocosm) আর ক্ষুদ্র জগৎ (Microcosm)। বহির্বিশ্ব বৃহৎ জগৎ। মানুষ ক্ষুদ্র জগৎ। বেদ উপনিষদের মতে বহির্বিশ্ব বিরাট ব্রহ্মের রূপ। মানুষের অন্তরে দহরাকাশে আত্মা অবস্থিত। এই আত্মা ও বহির্জগতে অনুস্যূত ব্রহ্ম, এক ও অভিন্ন—ইহা বৈদিক সিদ্ধান্ত।

বৌদ্ধমতে কোন বস্তুই স্থির নহে। পরিবর্ত্তনের স্রোত অনবরত বহিয়া যাইতেছে। যাহার পরিবর্ত্তন হইতেছে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, পরিবর্ত্তনই কেবল দেখা যায়। অন্তর্জগতে কেবলি পরিবর্ত্তন। প্রতীতি, বেদনা, ইচ্ছা একটির পরে একটি উঠিতেছে ও বিলীন হইতেছে। যাহাতে এই সকল উঠিতেছে ও বিলীন হইতেছে তাহার দেখা পাওয়া যায় না। কতগুলি মানসিক অবস্থা ভিন্ন, আত্মা বলিয়া কোন স্থির বস্তুর কল্পনা অলীক। ইহাই শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদের মূল।

ন্যায়-সূত্র বৌদ্ধের মতবাদ খণ্ডন করিয়া বহির্জগতে ও

অন্তর্জগতে স্থায়ী শাশ্বত বস্তুর সত্তা স্থাপন করিয়াছেন। ন্যায় সূত্রের ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, গৌতমের মতকে সুব্যক্ত করিয়া প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

বৌদ্ধ দার্শনিকদের পক্ষ হইতে বাৎস্যায়নকে খণ্ডন করেন দিঙ্‌নাগ। দিঙ্‌নাগের খণ্ডনের উত্তর দেন উদ্যোতকর ন্যায়-বার্ত্তিকে। ধর্ম্মকীর্ত্তির ন্যায়বিন্দু, উদ্যোতকরকে খণ্ডন করিয়া দিঙ্‌নাগের বৌদ্ধমত পুনঃ স্থাপন করে। বাচস্পতি-মিশ্র তাঁহার ন্যায়-বার্ত্তিক-তাৎপর্য্যটীকা গ্রন্থে বৌদ্ধ পক্ষের দিঙ্‌নাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তিকে খণ্ডন করিয়া বাৎস্যায়নের ভাষ্যকে মণ্ডন করেন অর্থাৎ সমুজ্জ্বল ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। বাচস্পতির অপর একটি গ্রন্থের নাম ন্যায়-সূত্রোদ্ধার।

বৌদ্ধ-দর্শনের শূন্যবাদ বিজ্ঞানবাদ প্রভৃতি পরিপূর্ণ রূপ নিয়াছে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে। গৌতম যদি ঐ সকল মত খণ্ডন করিয়া থাকিবেন তাহা হইলে তিনি পরবর্ত্তী মানুষ হন। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে এইরূপ বলা যায়, কোন দার্শনিক মতবাদ এক শতাব্দীর মধ্যে মূর্ত্তি লাভ করে না। ইহাতে অন্ততঃ দুই তিন শতাব্দী লাগে। সুতরাং শূন্যবাদ বিজ্ঞানবাদ পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান ছিল। গৌতম তাহাই খণ্ডন করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে গৌতমের ন্যায়সূত্র আলোচনা করিলে স্বতঃই মনে হয়, ঐরূপ সুশৃঙ্খলিত সূক্ষ্ম-বিচারপূর্ণ গ্রন্থ একজনের এক জীবনের কাজ নহে। তিন চারিশত বৎসর ধরিয়া উহার ভাবনা ও ক্রমবিস্তার চলিতেছিল। ন্যায়সূত্রের যে প্রথম রূপ তাহাতে

পাঁচটি বিষয় ছিল। ক্রমে উহা ষোলটি বিষয়ে পরিণত হয়। সত্যের স্থাপন ও মিথ্যার খণ্ডনই ন্যায়-দর্শনের প্রধান কার্য্য। এই কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সাধন করিতে ষোলটি বিষয়ের আলোচনা প্রয়োজন। প্রথম সূত্রেই সূত্রকার ঐ ষোলটি বিষয়ের নাম করিয়াছেন।

১। প্রমাণ—জানিবার উপায়, Means of knowledge।

২। প্রমেয়—জানিবার বিষয়, Object of knowledge।

৩। সংশয়—সন্দেহ, Doubt।

৪। প্রয়োজন—উদ্দেশ্য, Purpose।

৫। দৃষ্টান্ত—উদাহরণ, Example।

৬। সিদ্ধান্ত—সত্য বলিয়া গৃহীত পদার্থ, Accepted truth।

৭। অবয়ব—তর্কের অংশবিশেষ, Member of syllogism।

৮। তর্ক—অনিষ্ট প্রসঙ্গ, Adoption of the contrary।

৯। নির্ণয—সত্য জানিবার জন্য প্রতিজ্ঞা, Determination for truth।

১০। বাদ—সত্যনির্ণয়ার্থ আলোচনা, Logical discourse।
'বাদঃ প্রবদতামহম্'—গীতা ১০ম।

১১। জল্প—এক কথার আর এক উত্তর, Wrangling।

১২। বিতণ্ডা—নিজ পক্ষ সিদ্ধি নাই, অন্য পক্ষ খণ্ডনের চেষ্টা —Destructive criticism।

১৩। হেত্বাভাস—প্রমাদযুক্ত হেতু, Fallacy।

১৪। ছল—বস্তু ত্যাগ করিয়া অর্থান্তর ধরিয়া তর্ক, Quibbling। যথা, কাশ্মীরাদাগতোহয়ং নবকম্বলবত্বাৎ। বাদী

'নূতন' অর্থে নব শব্দটি বলিয়াছেন, 'নয়টি' এই অর্থ ধরিয়া উত্তর করিলে তাহা 'ছল'।

১৫। জাতি—শুধু সাধর্ম্য-বৈধর্ম্য দ্বারা দোষোদ্ভাবন, Dilemma। যথা, শব্দঃ অনিত্যঃ কার্যত্বাৎ ঘটবৎ। ইহার উত্তরে যদি বলা হয়, শব্দো নিত্যঃ অমূর্তত্বাৎ আকাশবৎ।

১৬। নিগ্রহস্থান—বিপ্রতিপত্তি (ভ্রম) বা অপ্রতিপত্তি (অজ্ঞতা), Misconception or Ignorance। যথা 'শব্দঃ অনিত্যঃ কার্যত্বাৎ' এইটি বলিয়া, স্থাপনে অশক্ত হইয়া বাদী যদি পরে বলেন, 'পর্ব্বতঃ অনিত্যঃ কার্যত্বাৎ,' তবে ইহা পক্ষ-পরিত্যাগ। এইটি বাদীর নিগ্রহস্থান।

প্রথম নয়টি বিষয়, বিচার দ্বারা বিশেষভাবে সত্য সংস্থাপনের জন্য প্রয়োজন। পরের সাতটি, অপর পক্ষের দোষ প্রদর্শন করতঃ তাহার মতবাদকে খণ্ডন করার জন্য প্রয়োজন। প্রতিপক্ষ, অন্যায় দোষ দেখাইলে তাহাকে অপ্রতিভ করিয়া স্বপক্ষ স্থাপনার্থও এই সাতটি আবশ্যক। মিথ্যাজ্ঞান দূর করিয়া সত্যকে স্থাপন করার প্রচেষ্টাই ন্যায়দর্শনের মুখ্য কার্য্য।

ন্যায়দর্শনের দুইটি ধারা, প্রাচীন ন্যায় ও নব্য ন্যায়। প্রাচীন ন্যায়ের আচার্য্য গৌতম। নব্য ন্যায়ের আচার্য্য গঙ্গেশ উপাধ্যায়। গঙ্গেশের গ্রন্থের নাম 'তত্ত্বচিন্তামণি। গঙ্গেশের পুত্র বর্দ্ধমান, উহার বিস্তার করেন 'তত্ত্বচিন্তামণি-ব্যাখ্যা' গ্রন্থে। বাসুদেব সার্বভৌম, উহাকে আরও সূক্ষ্মরাজ্যে লইয়া যান।

রঘুনাথ শিরোমণির তত্ত্বচিন্তামণির টীকা 'দীধিতি' গ্রন্থে,

জগদীশের জাগদীশী, গদাধরের গদাধরী ও মথুরানাথের মাথুরী ব্যাখ্যাতে, নব্য ন্যায়ের প্রমাণের বিচার অতি সূক্ষ্মরাজ্যে চলিয়া যায়।

প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, নৈয়ায়িকদের আলোচনা, প্রমাণের বিশুদ্ধতা লইয়াই অধিক। প্রমেয় বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা অপেক্ষাকৃত কম। বৈদিক আন্বীক্ষিকী বিদ্যা, ন্যায় দর্শনের মূল। উহা বৌদ্ধধর্ম্মের পূর্ববর্ত্তী। উহার ঋষি অক্ষপাদ। অনেকে মনে করেন, গৌতম ও অক্ষপাদ একই ব্যক্তি।

পরমাণুবাদ

ন্যায় ও বৈশেষিক উভয় দর্শনই পরমাণুবাদী। পরমাণু হইতেই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টি। পরমাণু কি ও কিভাবে কল্পিত হয় তাহা বলা যাইতেছে। পরমাণু ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নহে।

গবাক্ষের জলমধ্যে সূর্য্যকিরণ প্রবেশ করিলে যে অতি সূক্ষ্ম রজঃকণা দৃশ্যমান হয় তাহাকে বলে ত্রসরেণু। উহার এক তৃতীয়াংশ দ্ব্যণুক। দ্ব্যণুকের অর্দ্ধাংশ পরমাণু। ত্রসরেণুর এক ষষ্ঠাংশ ($\frac{১}{৬}$) হইল পরমাণু। ইহা দ্রব্যের ন্যূনতম বিভাগ। পরমাণু নিত্য। আচার্য্যগণ বলেন অবয়বের অতিরিক্ত অবয়বী আছে। পরমাণুপুঞ্জই যে ঘটরূপে প্রতীয়মান হয় তাহা নহে। তদতিরিক্ত অবয়বী একটি পদার্থ। ক্ষুদ্রতম অণুতম অবয়ব হইল পরমাণু।

দ্রব্য নয়টি। তন্মধ্যে আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, এই চারিটি বিভু ও নিত্য। উহারা অবিভাজ্য, নিরবয়ব। মন অণু-পরিমাণ, উহাও অবিভাজ্য। ইহা ভিন্ন পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু এই চারিটি অনিত্য দ্রব্যেরও চরম অবয়ব নিত্য পরমাণু। পরমাণুর অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ এইরূপ দেখান হয়—

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক্ষুদ্রতম দ্রব্যাংশ হইল ত্রসরেণু। সাবয়ব অনিত্য দ্রব্যের অবয়ব আছে বলিয়া তাহার বিভাগের একটি চরমাবস্থা মানিতেই হইবে। নচেৎ মেরু আর সর্ষপ উভয়েই অনন্তাবয়ব বলিয়া উহাদের তুল্যত্ব হইয়া পড়িবে। তাই অবয়বধারার কোন একস্থানে বিশ্রান্তি মানিতে হইবে। প্রত্যক্ষ সূক্ষ্মতম পদার্থ ত্রসরেণুতে বিশ্রান্তি মানা যায় না। কারণ ত্রসরেণু সাবয়ব, যেহেতু তাহা চাক্ষুষ দ্রব্য। ত্রসরেণুর আরম্ভক দ্ব্যণুকও সাবয়ব, কারণ তাহা সাবয়বের আরম্ভক। দ্ব্যণুকের অবয়ব পরমাণু। আরও অবয়বধারা মানিলে অনবস্থা দোষ হয়।

সাংখ্য-দর্শন

সাংখ্য-দর্শনের ভিত্তিও বৈদিক। 'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং' ইত্যাদি উপনিষদের মন্ত্র তাহার মূলে। ন্যায়-বৈশেষিকের ষোড়শ পদার্থ বা সপ্ত পদার্থ, সাংখ্য মানেন নাই। সাংখ্য বলেন—একটি মূল বস্তু হইতে বিশ্বের সৃষ্টি। তাহার নাম প্রকৃতি। প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা। তাহার ক্রম অভিব্যক্তি হইতে নিখিল সৃষ্টির প্রকাশ। প্রকৃতির এই অভিব্যক্তির উদ্দেশ্য, পুরুষের ভোগ ও অপবর্গসাধন। জড় ও চেতন হইতে জগৎ। পুরুষ চৈতন্য-স্বরূপ, প্রকৃতি জড়া, দুই একত্রিত থাকায় প্রকৃতির ধর্ম্ম পুরুষে আরোপিত হয়। সেই জন্য পুরুষ নানাপ্রকার দুঃখ পায়। যেদিন পুরুষ জানিবে আমি প্রকৃতি নহি, প্রকৃতি হইতে ভিন্ন পদার্থ, আমি শুদ্ধ মুক্ত চৈতন্যস্বরূপ—তখনই তাহার দুঃখের অবসান হইবে—কৈবল্য লাভ ঘটিবে। বস্তুতঃ অনাদি অজ্ঞান হইতে মুক্তি হইবে বিবেকজ্ঞানের উদয়ে। বিবেকজ্ঞান, পুরুষের স্বরূপোলব্ধিমাত্র। বস্তুতঃ পুরুষের বন্ধনও সত্য নহে, তাই মুক্তিও সত্য নহে। পুরুষ সর্ব্বদাই মুক্ত।

কপিল ঋষি সাংখ্য-সূত্রের প্রণেতা। কপিল বুদ্ধদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী। কারণ বুদ্ধদর্শন সাংখ্য হইতে অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছে। সাংখ্যের আরম্ভ দুঃখবাদে—'দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা' (সাংখ্যকা.)—ত্রিবিধ দুঃখের আঘাত হইতেই জিজ্ঞাসা জাগে। বুদ্ধদেবের নিজ জীবনী তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। ব্যাধি, জরা ও

মৃত্যু—মানব জীবনের এই সব দুঃখ দেখিয়া, কি উপায়ে দুঃখ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে ভাবিতে ভাবিতে, তিনি সংসার ছাড়িয়া কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন।

পুরুষ, প্রকৃতির বন্ধন মুক্ত হইলেই স্ব-স্বরূপে স্থিত হন। তাহা হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি—ইহা সাংখ্যের মত। মুক্তির জন্য কোন ঈশ্বর-শক্তির সহায়তা লইবার প্রয়োজনীয়তা সাংখ্য মনে করেন নাই। বুদ্ধদেবও দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কোন ঈশ্বরের অপেক্ষা বোধ করেন নাই। নিজ তপস্যা বলেই তাহা সম্ভব—ইহা শুধু মনেই করেন নাই, নিজ সাধন দ্বারা তাহা প্রকাশও করিয়াছেন।

এই দুইটি বিষয়ে সাংখ্য দর্শনের সিদ্ধান্ত ও বুদ্ধদেবের জীবন অনুরূপ। তবে পরবর্ত্তী কালে বুদ্ধদেবের শিক্ষা হইতে অনেক দূর সরিয়া গিয়া তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্য দার্শনিকেরা যে নানারূপ মতবাদ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে সাংখ্যের মিল পাওয়া যাইবে না। বৌদ্ধ গ্রন্থে আছে কপিল, বুদ্ধের পূর্ববর্ত্তী আচার্য্য। কপিলের শিষ্য আসুরি, তাঁহার শিষ্য পঞ্চশিখ। শিষ্য-পরম্পরা-ক্রমে আগত মহামতি ঈশ্বরকৃষ্ণ—সাংখ্য-কারিকা গ্রন্থ রচনা করেন। এই কারিকা খুব জনপ্রিয়। কারিকা-গ্রন্থে ৭০টি কারিকা আছে। তাহাতেই সমগ্র ষষ্টিতন্ত্র গ্রন্থের তাৎপর্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই কারিকার উপর গৌড়পাদের ভাষ্য আছে। মাণ্ডূক্যোপনিষদের উপর গৌড়পাদের উৎকৃষ্ট কারিকাও আছে। এই দুইটির দার্শনিক দৃষ্টি এক নহে। ঐ দুই গৌড়পাদ একই ব্যক্তি কি না বলা যায় না।

অনিরুদ্ধের সাংখ্য-সূত্রবৃত্তি, মহাদেবের সাংখ্য-সূত্র-বৃত্তিসার, নাগেশের লঘুসাংখ্য-সূত্রবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ কপিল-সূত্রের উপর বিশেষ আলোকপাত করিয়াছে। টীকার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সাংখ্য-কারিকার উপর বাচস্পতি মিশ্রের সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী। বিজ্ঞানভিক্ষুর সাংখ্যপ্রবচন-ভাষ্য, সাংখ্যসূত্রের উপর এক উপাদেয় ব্যাখ্যান। কিন্তু এই সাংখ্যসূত্রের মৌলিকতা প্রাচীনগণ স্বীকার করেন নাই। এই সূত্র কপিল সাংখ্য-সূত্র নহে—বলা হয়। ভিক্ষুর পূর্ব্বগামী কেহই ইহা মানেন নাই। বিজ্ঞানভিক্ষুর আরও অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ আছে—সাংখ্যসার, যোগবার্ত্তিক, পাতঞ্জল সূত্রের ব্যাসভাষ্যের টীকা, যোগসারসংগ্রহ প্রভৃতি। বিজ্ঞানভিক্ষু সকল দর্শনের আচার্য ছিলেন। প্রবচনভাষ্যে তিনি ন্যায়, সাংখ্য, যোগ ও বেদান্তের ভক্তিবাদের ব্যাখ্যানকে সমন্বয় করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। অদ্বৈত বেদান্তকে তিনি আদর করিতেন না। তিনি আচার্য শঙ্করের মতকে আধুনিক-বেদান্তিব্রুবাণাম্' বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। এই জন্য তিনি বেদান্তসূত্রের উপরও ভক্তিবাদ-স্থাপনার্থ 'বিজ্ঞানামৃত-ভাষ্য'-নামক একটি ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। অন্য সকল দার্শনিকের উপর সাংখ্যদর্শনের প্রভাব বিপুল। ভাগবতে বর্ণিত অবতার কপিল এবং সাংখ্যের কপিল সম্ভবতঃ একই ব্যক্তি। 'ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে, জ্ঞানৈর্বিভর্তি জায়মানং চ পশ্যেৎ,' ইত্যাদি শ্রুতিতে কপিলের অলৌকিক জ্ঞানের কথা বর্ণিত আছে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।' (১০।২৬)

এই বিশাল বিশ্ব প্রপঞ্চের সৃষ্টিরহস্য লইয়া সাংখ্যদর্শনের

ধ্যান। সাংখ্যদর্শন সৎকার্যবাদী। যাহা কার্যে দেখা যায় তাহার বিদ্যমানতা কারণের মধ্যেই নিহিত ছিল। শুধু অভিব্যক্তি ছিল বাকি। সৃষ্ট হওয়া অর্থ, অভিব্যক্ত হওয়া।

ন্যায়-দর্শন অসৎকার্যবাদী। তাহার মতে, কারণে পূর্ব হইতেই কার্য ছিল না। তাহার সৃষ্টি নূতন। যখন একটি ঘট সৃষ্টি হইল তখনই তাহার আরম্ভ হইল। মাটির মধ্যে ঘটের বিদ্যমানতা ছিল না। এই মতকে বলে আরম্ভবাদ বা অসৎকার্যবাদ। সাংখ্য বলেন, ঘট মাটির মধ্যে অব্যক্ত ছিল। সৃষ্টি হইল বলিয়া ব্যক্ত হইল। সাংখ্য বলেন, এই মত না মানিলে যে কোন জিনিস হইতে যে কোন সৃষ্টি হইতে পারে। মাটি হইতে কাপড় হইতে পারে, সূতা হইতে ঘট হইতে পারে। ইহার উত্তরে ন্যায়-দর্শন বলেন, ঘট যখন মাটির মধ্যেই ছিল, তখন কুম্ভকারের প্রয়োজনীয়তা কি? মাটিয় দ্বারাই জল আহরণ সিদ্ধ হউক। উত্তরে সাংখ্য বলেন, কুম্ভকারের প্রায়াসটা অভিব্যক্তির সহায়ক মাত্র। ন্যায় কূটতর্ক তুলিয়া প্রশ্ন করেন, অভিব্যক্তি জিনিসটা কি আগে ছিল? না নূতন হইল? যদি বলেন আগে ছিল, তাহা হইলে কুম্ভকারের সহায়তার দরকার কি? যদি বলেন ছিল না, তবে তো আরম্ভবাদই মানা হইল।

সাংখ্যের চরম উত্তর হইল, গীতার বাণী—

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।" (২।১৬)

এই শ্লোক বাচস্পতি মিশ্র 'সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী'তে উদ্ধৃত করিয়া সৎকার্য-বাদকে স্থাপন করিয়াছেন।

নিখিল বিশ্বসংসার, প্রকৃতির মধ্যে লুক্কায়িত ছিল। প্রাকৃতিক প্রথম পরিণতি হইল মহৎ। প্রকৃতি হইল সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা। পুরুষের সান্নিধ্যে কর্ম্মবশে সাম্যাবস্থার প্রচ্যুতি ঘটিলে প্রকৃতির পরিণতি আরম্ভ হইল। জবা পুষ্পের সান্নিধ্যে স্বচ্ছ প্রকৃতি, প্রসবধর্ম্মী হইলেন। নচেৎ অচেতন কিরূপে সৃষ্টি করিবে ?

প্রকৃতির প্রথম পরিণাম বুদ্ধি বা মহত্তত্ত্ব (মহান্)। মহান্ হইতে অহঙ্কার। অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্র। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ স্থূল ভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব প্রাকৃত (প্রকৃতি ও প্রকৃতিজাত)। আর একটি তত্ত্ব হইল পুরুষ।

"মূল-প্রকৃতিরবিকৃতি র্মহদাদ্যাঃ প্রকৃতিবিকৃতয়ঃ সপ্ত।
ষোড়শকস্তু বিকারো ন প্রকৃতি র্ন বিকৃতিঃ পুরুষঃ॥ সাংখ্য কা.

পুরুষের অনাদি কর্ম্মবশে তাহার জন্য ভোগায়তন (দেহ) ও ভোগের উপাদান সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছেন প্রকৃতি। সেই প্রকৃতিই আবার পরম সূক্ষ্ম যে প্রকৃতি-পুরুষবিবেক, তাহা পুরুষকে দেখাইয়া তাঁহার অপবর্গ সাধনও করেন। তবেই পুরুষের ভোগাপবর্গ-সাধনই হইল প্রকৃতির কার্য্য।

"সর্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ পুরুষস্য সাধয়তি বুদ্ধিঃ।
সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ প্রধানপুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্॥"

সাংখ্য. কা.

যোগ-দর্শন

যোগ শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত হয়। যোগ অর্থ কার্য্য করার কৌশল বা প্রণালী, 'যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্', গীতা। যোগ অর্থে যুক্ত করা, একটি বস্তুর সঙ্গে আর একটি বস্তুর মিলন করাইয়া দেওয়া।

বিষয়াকৃষ্ট মানুষ ভগবান্ হইতে সরিয়া যায়। যে উপায়ে তাহাকে আবার ঈশ্বরের সহিত যুক্ত করা যায় তাহাই যোগ। যোগদর্শনে যোগ শব্দের অর্থ যুক্ত করা নহে। যোগ অর্থ একটি প্রচেষ্টা। পুরুষ ও প্রকৃতি মিলিয়া যে একাকার হইয়াছে তাহাকে বিযুক্ত করার প্রয়াসই যোগ। আত্মা প্রকৃত-স্বরূপের সঙ্গে যুক্ত হইলেই অপ্রকৃতের বিয়োগ ঘটে। বহিরিন্দ্রিয় ও মনকে কঠোরভাবে সংযত করিবার প্রচেষ্টাই পতঞ্জলির যোগ বা সমাধি। সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত এই দ্বিবিধ সমাধির অবস্থা যোগ—সেই অবস্থায় পৌঁছাইবার প্রণালীকেও বলে যোগ। ঈশ্বরের যে অসীমশক্তি তাহাকে যোগশক্তি বলে। ঈশ্বরকে গীতায় যোগী বলা হইয়াছে।

"কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।" ১০।১৭

আবার ঈশ্বরকে শ্রেষ্ঠ যোগী বা যোগেশ্বরও বলা হইয়াছে

"যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্।" ১১।৪

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ—(১৮।৭৮)

দৈহিক ও মানসিক কতগুলি কর্ম্ম ও বৃত্তিকে সংযত করিয়া পূর্ণতা-লাভের একটি সুশৃঙ্খল প্রযত্ন, পতঞ্জলির যোগশাস্ত্রে দৃষ্ট

হয়। সাংখ্য যে দার্শনিক দৃষ্টি দিয়াছে, পতঞ্জলি তাহাকে জীবনে রূপায়িত করিতে যত্নবান্। সর্ব্বাগ্রে চিত্তের বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিয়া চিত্তকে শুদ্ধ শান্ত স্থির করিয়া কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে হইবে। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" (পত ১।২)

পাণিনির মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর লোক। আমরা দুই পতঞ্জলিকে একই ব্যক্তি ধরিয়া লইলাম। যোগসূত্রকার তাহা হইলে বুদ্ধদেবের পরবর্ত্তী লোক।

বুদ্ধদেব যোগ সাধনা করিয়াছিলেন। তিনি আহারবিহারে অত্যন্ত কঠোরতা করিয়া দেহপীড়নও করিয়াছিলেন। আবার তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য গভীর ধ্যানেও নিমগ্ন রহিয়াছিলেন। ললিতবিস্তর গ্রন্থপাঠে জানা যায় তৎকালে কত প্রকার যোগের ক্রিয়া ছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থে চিত্ত সংযত করার উপায়ের কথা অনেক আছে। সুবিস্তৃতভাবে আছে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে। মহাভারতে, গীতায়, উপনিষদে, জৈন বৌদ্ধ গ্রন্থাবলীতে সর্বত্রই যোগপ্রসঙ্গ আছে। পতঞ্জলি তৎপূর্ববর্ত্তী সকল প্রকার যুক্তিযুক্ত বিষয়গুলি বিচার করিয়া একটি সুশৃঙ্খলিত ক্রমধারায় চিত্তশুদ্ধি করা হইতে আরম্ভ করিয়া অসম্প্রজ্ঞাত বা নির্বীজ সমাধির কথা ক্রমে ক্রমে বিকশিত করিয়াছেন।

যোগসূত্রের অত্যুৎকৃষ্ট ভাষ্য ব্যাসভাষ্য। বাচস্পতি মিশ্র ব্যাসভাষ্যের "তত্ত্ববৈশারদী" টীকা লিখিয়াছেন। ভোজরাজের "রাজমার্ত্তণ্ড", ব্যাসভাষ্যের উপর বিজ্ঞানভিক্ষুর "যোগবার্ত্তিক" প্রভৃতি গ্রন্থ যোগতত্ত্ব অনুধাবনের জন্য অতীব মূল্যবান্।

যোগদর্শনের দান, সকল দার্শনিকেই গ্রহণ করিয়াছেন। আচার্য্য শংকর ব্রহ্মসূত্রাবলম্বনে যোগ খণ্ডন করিতে গিয়াও তাহার বিবিধ প্রভাব স্বীকার করিয়াছেন ঃ—

"এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ" (ব্র. সূ. ২।২)

এই সূত্রটির ভাষ্যগ্রন্থে।

পূর্ব-মীমাংসা

উত্তর মীমাংসার পূর্ববর্ত্তী বলিয়া এই দর্শনের নাম পূর্ব-মীমাংসা। এই পূর্ব্ববর্ত্তিতা ঐতিহাসিক দিক্ দিয়া নহে, বিচারের ধারার দিক্ দিয়া এই পূর্ববর্ত্তিতা—chronological নহে, logical। ব্রহ্মবাদী শঙ্করও স্বীকার করেন—জীবের মনকে ব্রহ্মমুখী করিতে হইলে তৎপূর্বে পবিত্র কার্য্যদ্বারা চিত্তশুদ্ধির প্রয়োজন। "শান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ।" সেই পবিত্র কর্ম্মই যজ্ঞাদি কার্য্য। অতএব তাহা বেদান্ত দর্শনের পূর্ববর্ত্তী হইল। তাই ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার পূর্ববর্ত্তী।

মীমাংসাদর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় বেদ ও বৈদিক যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধিনিষেধ ও বিনিয়োগ, ফলাফলের আলোচনা। বৈদিক মন্ত্রের অর্থবোধ ও বিনিয়োগ—উদাত্তাদি স্বরবর্ণ ইত্যাদির যথাযথ যোগ না হইলে তাহা ফলপ্রদ হয় না। উদাত্তাদি স্বরের উচ্চারণে ভুল হইলে তাহাতে কখনও কখনও বিপরীত ফলও হয়, যজমানের সর্ব্বনাশ হয়। মহাভাষ্যে দৃষ্ট হয়—

"দুষ্টঃ শব্দঃ স্বরতো বর্ণতো বা, মিথ্যাপ্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।

স বাগ্বজ্রো যজমানং হিনস্তি, যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥"

'ইন্দ্রশত্রুর্ব্বর্ধস্ব' বলিয়া আহুতি দেওয়া হইল। ইন্দ্রের শত্রু বা হন্তা এই অন্তোদাত্ত ষষ্ঠীসমাস অভিপ্রেত, কিন্তু ঋত্বিক্ ভুল করিলেন, ইন্দ্রঃ শত্রুর্যস্য এই বহুব্রীহি সমাসে আদ্যুদাত্ত উচ্চারণ করিলেন। ফলে ইন্দ্রের হাতে বৃত্র মরিল। বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের

ব্যাখ্যানই ছিল আর্য ধর্ম্মের মূলভিত্তি। যখন বৌদ্ধধর্ম তাহার উপর গুরুতর আঘাত দিল তখন প্রয়োজন হইল সমগ্র বৈদিক সাহিত্যের ও ঐতিহ্যের পুনরালোচনা ও তাহা যুক্তি-বিচারের ভিত্তিতে স্থাপন করা। বেদের সত্যতা ও যজ্ঞাদির প্রয়োজনীয়তা, জৈমিনি ঋষি শুদ্ধ বিচারের ভিত্তিতে উপস্থাপন করিয়া সূত্রাকারে প্রকাশ করেন। এই শাস্ত্রই পূর্ব্বমীমাংসা বা সংক্ষেপে মীমাংসা-শাস্ত্র। জৈমিনির মীমাংসাসূত্রসকল আলোচনা করিলে বুঝা যায় (presupposes) যে তৎপূর্ব্বের বহু সহস্র বৎসরের গবেষণা, ভাবনা, আচরণ ও চিন্তাধারা তাহার পশ্চাতে বিদ্যমান আছে।

সূত্রে জৈমিনি আলোচনা করেন নানাপ্রকার কর্ম ও তাহার উদ্দেশ্যের কথা। ধর্ম্ম কি, অপূর্ব্ব কি, ইহা লইয়া জৈমিনি বিস্তর গবেষণা করেন। সূত্রগ্রন্থে বারটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের বিষয়বস্তু দার্শনিক পর্য্যায়ে পড়ে। জ্ঞান কি, কি করিয়া জ্ঞান জন্মে, জ্ঞানের যথার্থতার মূল কোথায় ইত্যাদি প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। বেদের প্রত্যেকটি বাক্যের সত্যতা স্থাপনে জৈমিনি যত্নবান্ হইয়াছেন। তাহার পরে দেবতা-কাণ্ডে তিনি বৈদিক উপাসনাতত্ত্ব বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

জৈমিনির মীমাংসা-সূত্র অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর লেখা। খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর লোক শবর স্বামী জৈমিনীয় সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন। কুমারিল ভট্ট, জৈমিনি ও শবর উভয়ের দানের ভিত্তিতে 'শ্লোক-বার্ত্তিক', 'তন্ত্রবার্ত্তিক' ও 'টুপটীকা' এই তিন গ্রন্থ রচনা করেন। কুমারিলের বিদ্যাবত্তা বিপুল।

অদ্বৈতবাদী শঙ্করও কুমারিলকে মর্য্যাদা দিয়া বলিয়াছেন "ব্যবহারে ভাট্টনয়ঃ।"

স্মুচরিত মিশ্র, শ্লোক-বার্ত্তিকের উপর 'কাশিকাবৃত্তি' লিখেন। সোমেশ্বর ভট্ট, তন্ত্রবার্ত্তিকের উপর 'ন্যায়-সুধা' লিখেন। বেঙ্কট দীক্ষিত তাঁহার বার্ত্তিকাভরণ গ্রন্থে টুপটীকার উপর আলোকপাত করেন। মণ্ডন মিশ্র ও প্রভাকর ভট্ট, কুমারিল ভট্টের শিষ্য। প্রভাকরের বিদ্যাবত্তায় মুগ্ধ হইয়া কুমারিল তাঁহাকে গুরু সম্বোধন করেন। এই জন্যেই প্রভাকরের মতকে গুরুমত বলা হয়। বৃহতী নামক গ্রন্থে প্রভাকর, গুরু কুমারিলের সঙ্গে কোন্ কোন্ বিষয়ে একমত হন নাই, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

কালিকানাথ তাঁহার প্রকরণ-পঞ্চক গ্রন্থে প্রভাকরের মতের সম্প্রসারণ করেন। ভাবনাথের ন্যায়বিবেক, প্রভাকর মতের অতি সূক্ষ্ম আলোচনা! মাধবের জৈমিনীয়-ন্যায়-মালাবিস্তর, অপ্পায় দীক্ষিতের বিধিরসায়ন, আপদেবের 'আপদেবী', 'যৌগাক্ষি', ভাস্করের অর্থসংগ্রহ ও খণ্ডদেবের ভট্টদীপিকা ও মীমাংসা-কৌস্তুভ—এইগুলি মীমাংসাদর্শন সম্বন্ধে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। খণ্ডদেব সপ্তদশ শতাব্দীর লোক। সুতরাং খৃষ্ট জন্মের চারিশত বৎসর পূর্ব্ব হইতে খৃষ্টের পরবর্ত্তী সতের শত বৎসর পর্য্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী মীমাংসা দর্শনের ইতিহাস। আজ পর্য্যন্ত হিন্দু জীবনের দশকর্ম্ম, বিধি-বিধান-নীতি ও উত্তরাধিকার, শ্রাদ্ধাশৌচাদি আইন, মীমাংসা-দর্শনভিত্তিক।

মীমাংসাদর্শনে আত্মতত্ত্ব

মীমাংসাদর্শনের মুখ্য আলোচ্য বিষয় বেদের যজ্ঞের বিধি-বিধান। বেদ যে সকল বিধান করিয়াছেন তাহা পালন করিলে পরকালে কল্যাণ বা সুখকর ফল পাওয়া যাইবে। যদি মৃত্যুতেই দেহের শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনেরও শেষ হয় তাহা হইলে বৈদিক বিধি-বিধান ও পরকালের ফলশ্রুতির সম্ভাবনা বা আশা ব্যর্থ হয়।

"স্বর্গকামো যজেত', স্বর্গ কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে। যজ্ঞ সুষ্ঠু হইলে স্বর্গে যাইবে কে? শরীরধারীর শরীর তো ভস্মে পরিণত হইল। সুতরাং আত্মা বলিয়া পদার্থটি যদি না থাকে—যে দেহের মরণেও মরে না—তাহা হইলে যজ্ঞাদির উপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে। বেদবাক্য কখন নিরর্থক নহে। সুতরাং দেহাতিরিক্ত মৃত্যুজয়ী আত্মা আছে। আত্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, বুদ্ধিও নহে। দেহের নাশের পরেও আত্মা থাকে, ইন্দ্রিয় নষ্ট হইয়া গেলেও আত্মা থাকে। সুষুপ্তিকালে বুদ্ধিও নিষ্ক্রিয়, কিন্তু তখনও আত্মা থাকে।

দেহের পরমাণুগুলি সকলই চেতনাহীন। সুতরাং সম্মিলিত দেহ চেতনা-বিশিষ্ট হইতে পারে না। দেহ একটি যন্ত্র (instrument), তাহাকে চালনা করে আত্মা। দেহ আত্মার সেবা করে। আমাদের স্মরণশক্তি আত্মার সত্তা প্রমাণিত করে।

বৌদ্ধমতে আত্মা একটি বস্তু নহে, ভাবের পর ভাব একটা ধারা মাত্র। বিজ্ঞান-সন্ততি, ক্ষণিক-বিজ্ঞান-সন্ততি, a series

of ideas। কুমারিল ভট্ট এই মতকে খণ্ডন করিয়া বলেন যে শুভাশুভ কর্মের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ফলাফল ভোগের জন্য জন্মজন্মান্তর-স্থায়ী একটি পদার্থ মানিতেই হইবে। তাহাই আত্মা।

বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যায় কর্ম-ফলাফল ভোগ ও জন্মান্তরের কোন সুষ্ঠু ব্যাখ্যা হয় নাই। অথচ এই দুইটি অনস্বীকার্য্য। আত্মা অণু নহে, কারণ দেহের নানাস্থানে সংঘটিত ব্যাপার সে একই সময় জানিতে পারে। শিরের পীড়া, চরণের কণ্টকক্ষত, পৃষ্ঠের আঘাত, এই সকল খবর সে একসময়ই জানে। আত্মা অণু হইলে ইহা একসঙ্গে জানিতে পারিত না। আত্মা বিভু সর্ব্বব্যাপী, এইজন্য সে অবহেলায় দেহ হইতে দেহান্তরে চলিয়া যাইতে সমর্থ। মুক্তি পর্য্যন্ত আত্মা দেহের সহিত যুক্ত। দেহকে আত্মা পরিচালনা করে। আত্মার শক্তি দেহের সকল প্রকার গতির হেতু।

আত্মা এক নহে, বহু। আত্মা বহু না হইলে ধর্মাধর্ম্মের ফলভোগ ব্যাহত হয়। ভীষণ বিশৃঙ্খলারও সৃষ্টি হয়। একের কর্মের জন্য ফলভোগ অন্যের করিতে হয়। তাহা হইলে বিশ্ব-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। "স্বকর্মফলভুক্ পুমান্", এইজন্য আত্মা এক নহে, বহু।

কেহ কেহ বলেন, আত্মা একই, তবে বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন প্রকারে দৃষ্ট হয় মাত্র। যেমন একটি সূর্য্য, ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে বিভিন্ন প্রভিভাত হয়। এই দৃষ্টান্ত শুনিতে ভাল হইলেও এইক্ষেত্রে খাটিবে না। কেন না সূর্য্য যে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্ট হয় ইহা

সূর্য্যের গুণ নহে, পাত্রের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু সুখ, দুঃখ, ধর্ম্ম, অধর্ম এ সকল তো দেহের গুণ নয়, আত্মারই ধর্ম বা গুণ।

প্রভাকর ভট্ট বলেন—আত্মা নিজে অচৈতন্য কিন্তু জ্ঞান, কর্ম্ম, অনুভূতি, সুখ-দুঃখের আশ্রয়স্থল। "জ্ঞানাশ্রয়ত্বেন ভাতি ন তু জ্ঞানস্বরূপত্বেন।" আত্মা একই সময় জ্ঞানের আশ্রয় ও বিষয় হইতে পারে না। সুতরাং আত্মজ্ঞান (self consciousness) আত্মার নাই। আত্মা নিজে চেতনাহীন (non-conscious)। আত্মা জ্ঞাতা ভোক্তা সর্বব্যাপী কিন্তু চৈতন্যহীন। বেদান্তমতে আত্মচৈতন্য অহংপ্রত্যয় (self consciousness) আত্মার স্বরূপ। কুমারিল বা প্রভাকর কেহই ইহা স্বীকার করেন না। মীমাংসকদের মূল আলোচ্য বিষয় আত্মা নহে। তাই আত্মার স্থাপন বা স্বরূপ নির্ণয়ে এই দর্শন অধিক আলোচনা করে নাই। এই আলোচনা আনুষঙ্গিক মাত্র।

বেদান্ত দর্শন

বেদান্ত শব্দের অর্থ বেদের শেষ। বেদের শেষাংশই উপনিষদ্। উপনিষদ্‌ভিত্তিক যে দর্শন তাহাই বেদান্ত-দর্শন। শেষ অর্থ, চরম লক্ষ্যও হয়। বাস্তবিক বেদান্তই বেদশাস্ত্রের চরম লক্ষ্য। বেদান্ত-সূত্রের অপর নাম ব্রহ্মসূত্র, ব্রহ্মপ্রতিপাদক সূত্র, যে সূত্রসমূহের উদ্দেশ্য, ব্রহ্মতত্ত্বকে স্থাপন করা। বৌদ্ধদর্শন ব্রহ্মতত্ত্বকে স্বীকার করেন নাই, যুক্তিতর্ক বিচার দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বকে খণ্ডন করিয়াছেন। হিন্দু মনীষীদের প্রবল চেষ্টা, ব্রহ্মতত্ত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে। কারণ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত না হইলে সনাতন ধর্মই নস্যাৎ হইয়া যায়।

বেদান্তসূত্রের অপর নাম শারীরক-সূত্র। শরীর অর্থ দেহ। এই সকল সূত্রে দেহহীন যে পরম সত্য, তাহাকে যেন দেহ দেওয়া হইয়াছে অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ করা হইয়াছে। তিলের মধ্যে যেমন তেল সমগ্র উপনিষদের মধ্যে তেমন ব্রহ্মতত্ত্ব আছে। শারীরসূত্র তাহাকে নিষ্কাশন করিয়া পরিস্ফুট করিয়াছে। উক্ত আছে "তিলেষু তৈলবদ্ বেদে বেদান্তঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।"

বেদান্তদর্শনের অপর নাম উত্তরমীমাংসা। জীবন প্রতিষ্ঠায় দুইটি মুখ্যবস্তু, ধর্ম্ম ও ব্রহ্ম। ধর্ম্ম কি, আলোচনা করিয়াছেন, পূর্ব্বমীমাংসা। ব্রহ্ম কি, আলোচনা করিয়াছেন, উত্তর-মীমাংসা। উত্তরমীমাংসায় ঋষি বাদরায়ণ উপনিষদের দার্শনিক তত্ত্বসমূহ মালার মত সুশৃঙ্খলিতভাবে গ্রথন করিয়াছেন,

'বেদান্ত-বাক্যকুসুমগ্রন্থনার্থত্বাৎ সূত্রাণাম্।' ব্রহ্মসূত্র গ্রথিত হইয়াছে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ভারতীয় হিন্দুজাতির জীবনযাত্রায় বেদান্তদর্শন প্রাণবন্ত। আজও হিন্দুধর্মে সেই ব্যক্তিগণের চিন্তা ভাবনা, ভজন, সাধন, পূজাপার্ব্বণ বেদান্তভিত্তিক। একমাত্র বেদান্তদর্শনই হিন্দু জীবনে জাগ্রত। অন্যান্য দর্শনগুলিতে প্রাচীন কথা শুধুই আলোচনা-গবেষণার বিষয়। যোগ-দর্শনের প্রণালীমত কিছু-সংখ্যক যোগী এখনও আছেন ধ্যানরত। তা ছাড়া ন্যায় বৈশেষিক পূর্ব্ব-মীমাংসা সাংখ্য দর্শনের নিত্যকার জীবন যাত্রার উপর কোন প্রভাব এখন প্রায় নাই বলিলেই চলে।

বাদরায়ণের পূর্ব্বেও বেদান্তের আচার্য্য ছিলেন। তাঁহাদের কয়েকজনের নাম বাদরায়ণ সূত্রমধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন—আশ্বলায়ন, ঔড়ুলোমি, কাশকৃৎস্ন প্রভৃতি। ভারতীয় ঐতিহ্য অনুসারে বেদব্যাস ও বাদরায়ণ একই ব্যক্তি। রামানুজ বল্লভ মধ্ব, বলদেব প্রভৃতি আচার্য্যগণ বেদব্যাস ও বাদরায়ণকে একই ব্যক্তি মনে করেন। তবে সকলে এই মত গ্রহণ করেন না। আচার্য্য শঙ্করের মত কি তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না।

যাহারা ঐ মত গ্রহণ করেন না তাঁহাদের যুক্তি এই যে, মহাভারতের জৈমিনি বেদব্যাসের শিষ্য। ব্রহ্মসূত্রে জৈমিনির নাম কয়েকবার আছে। নিজ শিষ্যের নাম অত মর্য্যাদার সহিত উল্লেখ করা খুব শোভন নহে। তা ছাড়া, মহাভারত ও তদন্তর্গত গীতা বেদব্যাসের রচনা এ বিষয় কাহারও সংশয় নাই। ব্রহ্মসূত্রে "স্মৃতৌ" বলিয়া কতিপয় স্থানে গীতাকে ও মহাভারতকে লক্ষ্য

করা হইয়াছে এরূপ মনে হয়। নিজের রচনাকে নিজে প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করাও খুব শোভন নহে। বেদান্তসূত্রে বাদরায়ণের নামের উল্লেখও আছে। তাহাতে মনে হয় তিনি তৃতীয় ব্যক্তি। তবে এইভাবে নিজের নাম উল্লেখ করা, নিজ রচনা প্রমাণরূপে উপন্যাস করা ভারতীয় সাহিত্যে অন্যত্রও দৃষ্টিগোচর হয়।

শঙ্করের শারীরক-ভাষ্যের ব্যাখ্যাতা 'ভামতী'কার বাচস্পতি মিশ্র। ভামতীর টীকা লিখিয়াছেন অমলানন্দ। টীকার নাম 'কল্পতরু।' অপ্পয় দীক্ষিতের "কল্পতরু-পরিমল" আবার কল্পতরু ব্যাখ্যান। বিদ্যারণ্য মুনীশ্বরের 'পঞ্চদশী' একখানি শ্রেষ্ঠ প্রকরণ গ্রন্থ। সর্বজ্ঞাত্ম মুনি লিখিয়াছেন, 'সংক্ষেপ-শারীরক।' তাঁহার টীকাকার রামতীর্থ। শ্রীহর্ষের 'খণ্ডনখণ্ডখাদ্য' মধুসূদন সরস্বতীর "অদ্বৈতসিদ্ধি", সদানন্দযতির 'বদান্তসার' অদ্বৈতবাদের উপর মূল্যবান্ গ্রন্থ। অদ্বৈতবাদ ও সাংখ্যদর্শনকে মিলাইয়া বিজ্ঞান-ভিক্ষু লিখিয়াছেন 'বিজ্ঞানমৃত-ভাষ্য'। তাহার উপর 'মণিপ্রভা' টীকা আছে। অদ্বৈতানন্দের 'ব্রহ্মবিদ্‌বিবরণী', গোবিন্দানন্দের 'রত্নপ্রভা', প্রকাশানন্দের 'সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী', লক্ষ্মীধরের 'অদ্বৈতমকরন্দ' প্রভৃতি বহু শঙ্কর মতের প্রতিষ্ঠাকরক।

বর্ত্তমানে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতীর "বেদান্ত-দর্শনের ইতিহাস" একখানি উপাদেয় গ্রন্থ। ইহা ইতিহাসের ধারা ধরিয়া লিখিত। ইহাতে অন্য সকল বেদান্তবাদীর মত আলোচনা করিয়া, খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতে আচার্য্য শঙ্করের আবির্ভাবকাল খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। বহু বিচার আলোচনা করিয়া তিনি ইহা সুদৃঢ়ভাবে স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

শঙ্কর-বেদান্ত : আত্মতত্ত্ব

শঙ্কর তাঁহার বেদান্তসূত্র ভাষ্যের প্রারম্ভেই প্রশ্ন তুলিয়াছেন—নিশ্চিতভাবে জানা কোন শাশ্বত সত্য আছে কি না। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সত্য সংবাদ দেয় না, শুক্তিকে মুক্তার মত দেখাইয়া দেয়। স্মৃতিও সকল বিষয় ঠিক ঠিক ভাবে উপস্থাপিত করিতে পারে না, ভুল জড়াইয়া যায়। স্বপ্ন যখন দেখি তখন স্বপ্নকেই সত্য মনে হয়। আমরা জাগ্রত অবস্থায় যাহা দেখি তাহা যে স্বপ্ন নয়, কে বলিবে? যাহা কিছু দেখি জানি ভাবি কিছুই সন্দেহমুক্ত নয়। নিঃসংশয়িত সত্য কি কিছুই নাই? শঙ্কর বলেন—একটিমাত্র অনুভূতিই আছে যেখানে বিন্দুমাত্র সংশয়ের অবকাশ নাই—সেটি হইল আত্মানুভূতি।

আমি যে আছি এই একটি বিষয়ে কাহারও বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। আমি নাই ইহা কোনদিনও কাহারও মনে হয় না। আমি যে আছি ইহা আমি যথার্থভাবেই জানি। আমাকে যে আমি জানি ইহা ইন্দ্রিয় দ্বারা জানি না—মন-বুদ্ধি দ্বারা জানি না—অনুমিতি দ্বারা জানি না, অথবা কোন শব্দ প্রমাণ দ্বারাও জানি না, ইহা আমার অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ অনুভূতি। সকল জ্ঞানেই জ্ঞাতা জ্ঞেয়ের মধ্যে একটা দেশ কাল বা ইন্দ্রিয়ের ব্যবধান আছে। কিন্তু আমাকে যে আমি জানি, ইহা ব্যবধান রহিত। আমার সঙ্গে আমি এক হইয়াই আমাকে জানি, মনের কত ভাবনা, কত সুখ-দুঃখ, সংবেদন স্রোতের মত চলিতেছে। তাহার পশ্চাতে আছে অহম্প্রত্যয়—আত্মানুভূতি।

আত্মসত্তাকে বাদ দিয়া কোন কিছুই ভাবনা করা যায় না। আমি নাই ভাবিতেও আমার প্রয়োজন। আমাকে যে অস্বীকার করিবে সেও তো আমি। যাহাকে অস্বীকার করিতে তাহারও স্বীকৃতি লাগে, সে কোনদিনই অস্বীকৃত হইতে পারে না। সুতরাং আত্মজ্ঞানই সংশয়রহিত শাশ্বতজ্ঞান। আত্মজ্ঞান জাগরণে আছে স্বপ্নে আছে, সুষুপ্তিতেও আছে। খুব সুনিদ্রা হইয়াছিল, স্বপ্নও দেখি নাই ইহাও আমি জানি। সুষুপ্তিকালে যে জ্ঞানের কোন বিষয়বস্তু ছিল না, তাহারও জ্ঞান আমারই। আত্মার সর্বপ্রকার অনুভূতির মূলেই আত্মসংবিৎ।

আমরা এই অহংকে ধরিতে পারি না, কিন্তু ইহার অনুভূতি কখনও আমাদিগকে পরিত্যাগ করে না। একমুহূর্তের জন্যও আত্মানুভূতি আমাদিগকে ছাড়িয়া কোথাও পলায়ন করিতে পারে না। এই জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, 'প্রতিবোধ-বিদিতম্।' ইহাকে প্রমাণ করা যায় না, কারণ সকল প্রমাণের মূলে ইনি বিরাজিত। ইনি একমাত্র বিজ্ঞাতা—সুতরাং ইহাকে জানিবে কিসের দ্বারা? "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।" এই বিজ্ঞাতা দ্বারাই সকল প্রমাণের প্রামাণ্য। "আত্মা তু প্রমাণাদিব্যবহারা-শ্রয়ত্বাৎ, প্রাগেব প্রমাণাদিব্যবহারাৎ সিধ্যতি।"

আত্মা আছে, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। কিন্তু ইহার স্বরূপ যে কি, তাহা আমরা জানি না। যাহাকে সকলে জানি তাঁহাকে কেহই জানি না। আমি কে, যথার্থভাবে জানিতে হইলে আমি যাহা নহি তাহাকে নিঃশেষ করিয়া বর্জন করিতে হইবে—ইহা ছাড়া জানিবার উপায় নাই। আমি কি নই—দেহ নই, ইন্দ্রিয়

নই, মন নই, বুদ্ধি নই, সুখ-দুঃখও নই—পরিদৃশ্যমান জগতের কিছুই আমি নই। দুইটি বস্তু আছে—আত্মা আর অনাত্মা। আত্মা বস্তু আর অনাত্মা অবস্তু। অবস্তুকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করিলে আত্মার স্বরূপ ব্যক্ত হইবে।

আত্মাই জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তিতে, বর্তমান অতীত ভবিষ্যতে সর্বাবস্থায় সত্য, অনাত্মা নহে। অনাত্মা মিথ্যা। আমরা সত্য মিথ্যাকে মিলাইয়া কোনপ্রকারে গোঁজামিল দিয়া চলিতেছি। জীবনের সাধনা হইল অনাত্মাকে পরিহার করিয়া আত্মাকে আত্মা বলিয়া যথাযথভাবে জানিয়া তাহাতে লাগিয়া থাকা। এইজন্য প্রয়োজন অনাত্ম বস্তুর প্রতি বৈরাগ্য, নেতিনেতি বিচার দ্বারা আত্মবস্তুর অনুধ্যান। আত্মানুভূতি সকলেরই আছে। কিন্তু এই জ্ঞান, অজ্ঞান অবিদ্যা দ্বারা আবৃত আছে। তপস্যা দ্বারা অবিদ্যার নাশ করিতে হইবে।

এই আত্মতত্ত্বের ভিত্তিতেই শঙ্করাচার্য্য, বৌদ্ধ যোগাচার-মত, শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। যোগাচারের মত এই যে আত্মা বলিয়া কিছুই নাই, কেবল আছে একটির পর একটি ক্ষণস্থায়ী চিত্তবৃত্তির প্রবাহ—ক্ষণিক বিজ্ঞানধারা। শঙ্কর বলেন, ঐ ধারা আত্মা নহে, তাহা আমরাও বলি। এই ধারার যিনি বিজ্ঞাতা তিনিই আত্মা। শূন্যবাদী বলেন স্থায়ী আত্মা বলিয়া কিছুই নাই। শঙ্কর বলেন আত্মা নাই বলিয়া যার সন্দেহ তিনিই তো আত্মা। আত্মবস্তু অখণ্ডনীয়। সকল জগৎ শূন্য এই কথা যারা বলেন তাঁদের জানা উচিত শূন্যতারও একজন দ্রষ্টা বা সাক্ষী প্রয়োজন। "শূন্যস্যাপি সসাক্ষিকত্বাৎ।"

সারকথা হইল নিখিল বিশ্বের সকল মিলিয়াও জ্ঞান সৃষ্টি করিতে পারে না। উপলব্ধিযুক্ত হইলেই জ্ঞান হয়। আত্মা হইল সেই উপলব্ধির স্বরূপ। 'নিত্যোপলব্ধি-স্বরূপত্বাদাত্মমঃ।' এই আত্মা বহু নহে, এক। অণু নহে, বিভু। বিভুবস্তু একাধিক থাকিতে পারে না। এই আত্মাই পরমাত্মা, পরব্রহ্ম। পরমাত্মাই সত্য, তদ্ভিন্ন যাহা কিছু সকলই মিথ্যা।

বদান্তে ভক্তিধারা

বেদান্তের সাধকগণের মধ্যে দুইটি ধারা—জ্ঞানধারা ও ভক্তিধারা। জ্ঞানধারায় শ্রেষ্ঠ আচার্য্য শঙ্কর। ভক্তিধারায় শ্রেষ্ঠ আচার্য্য রামানুজ। শঙ্কর-দর্শনের সংক্ষিপ্ত আলোচনা দ্বারা আমরা জ্ঞানবাদীর ভাবধারা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অবগত হইয়াছি।

এখন ভক্তিধারার কথা কিছু বলিতেছি।

বেদ-বেদান্ত কঠিন বিষয়। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ ছাড়া অপর কাহারও তাহাতে প্রবেশাধিকার না থাকায় সাধারণ নর-নারীর জন্য আগম তন্ত্র ও পুরাণ প্রচলিত হইয়াছিল।

ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো মাময়ং প্রহরেদিতি॥

মহাভারত একখানি বিরাট পুরাণ। যাহারা বেদে অনধিকারী তাহাদের জন্যই মহাভারত রচনা। তন্ত্রশাস্ত্র জাতিভেদ মানেন নাই। সুতরাং তাহাতে সকলেরই অধিকার ছিল। এই গ্রন্থগুলিতে ভক্তিবাদেরই প্রাধান্য। এইজন্য প্রাচীনকাল হইতেই

বৈদিক ধারার পাশাপাশি প্রকট ভক্তিধারাও প্রবাহিত ছিল। দ্রাবিড় দেশের গাথাগুলি নির্ম্মল ভক্তিরস-মণ্ডিত।

ভক্তিধারা বহু সম্প্রদায় মধ্যে বিদ্যমান ছিল—বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি। বৈষ্ণবদের শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ছিল পাঞ্চরাত্র, পরে বিষ্ণু পুরাণ, ভাগবত-পুরাণ। শৈবসম্প্রদায়ের গ্রন্থ ছিল, শৈব আগম। শাক্তসম্প্রদায়ের অবলম্বন ছিল তন্ত্র, কালিকাপুরাণ এবং দেবী-ভাগবত। ক্রমে বহু পুরাণ প্রচারিত হইল। অধিকাংশ পুরাণই ভক্তিভাবপূর্ণ। শঙ্করের অদ্বৈতবাদ কঠিন, শুষ্ক ও রসহীন। তাহা দ্বারা সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধির তৃপ্তি হয়, সর্ব্বসাধারণের প্রাণের লালসা মিটিতে পারে না। প্রাণ চায় ভগবান্‌কে পূজা করি, তাঁর কাছে অন্তরের নিবেদন জানাই, তাঁকে ভালবাসি, তাঁর কাছে প্রাণের ভাবের আদান প্রদান করি।

এই লালসা অদ্বৈতবাদের নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম দ্বারা মিটে না। এই লালসা মিটাইতে খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে রামানুজ আচার্যের আবির্ভাব। রামানুজের পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য (দশম শতাব্দী) ও যাদবপ্রকাশ নামক দুইজন ভক্তপুরুষ অবির্ভূত হইয়া ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছেন। যাদবপ্রকাশ রামানুজের গুরুদেব। যাদবপ্রকাশ অদ্বৈতবাদ-সমর্থক হইলেও চিৎ অচিৎ এবং ঈশ্বর, ব্রহ্মের এই তিনটি বিভাব স্বীকার করিয়াছেন।

চিৎ অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনটি তত্ত্বের ভিত্তিতেই রামানুজ-দর্শনের প্রতিষ্ঠা। ভাস্কর ও যাদব উভয়েই ভেদাভেদের প্রচার করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ভেদাভেদবাদই প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। যাদব বলিয়াছেন ঈশ্বর, ব্রহ্মের

উপাধিযুক্ত প্রকাশ। রামানুজ গুরুর মত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন —ব্রহ্ম আর ঈশ্বর একই তত্ত্ব। ইহার মধ্যে কোন উপাধির স্থান নাই।

রামানুজাচার্য্যের দুইটি প্রধান কার্য্য শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদ খণ্ডন ও ভক্তের আরাধ্য অশেষ কল্যাণ গুণময় ভগবান্‌কে স্থাপন। অদ্বৈতবাদ পরবর্ত্তী কালে আরও অনেকে খণ্ডন করিয়াছেন কিন্তু এই খণ্ডনকার্য্যে রামানুজ যে বিচারমল্লতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অতুলনীয়। বেদের বিষ্ণুই রামানুজের ভগবান্। তিনি এবং পরব্রহ্ম অভিন্ন। ভক্তি দ্বারাই তাঁকে লাভ করা যায়।

রামানুজ আচার্য্যের শ্রীভাষ্যের শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা সুদর্শন ভট্টের শ্রুতি-প্রকাশিকা। বেদান্ত-দেশিক, শ্রীভাষ্যের টীকা ও রামানুজকৃত গীতা ভাষ্যের উপর টীকা রচনা করেন। তাঁহার আর দুইখানি গ্রন্থ, পরমতভঙ্গ ও রহস্যত্রয়সার। সেশ্বর-মীমাংসা নামক আর একখানি গ্রন্থে তিনি দুই মীমাংসাকে এক করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, কর্ম্মমাত্রই ফলদানে সমর্থ নহে। ঈশ্বরের অনুগ্রহ যুক্ত না হইলে কর্ম্ম, ফল দিতে পারে না।

'ন্যায়সিদ্ধাঞ্জন' ও 'তত্ত্বমুক্তাকল্প' রামানুজীয় ধারার দুইখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। শ্রীনিবাসাচার্য্যের 'যতীন্দ্রমত-দীপিকা' ও 'মায়াবাদ শতদূষণী' গ্রন্থ রামানুজ মতকে পোষণ করে। রামানুজের শ্রীভাষ্যের উজ্জ্বল প্রভাব আজ পর্য্যন্ত অম্লান। ভক্তিরাজ্যের মাধবাচার্য্য, বল্লভ, রামানন্দ, কবীর, তুলসীদাস, নানক, বলদেব সকলেই রামানুজাচার্য্যের মহাদানের কাছে ঋণী। গৌড়ীয় মতবাদের মূল ভিত্তিও শ্রীভাষ্য।

সাংখ্যমতে—মুক্তি

সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগই বন্ধন। উহাদের বিবেকই মুক্তি। "তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্"—পাতঃসূত্র। অর্থাৎ বিয়োগ বা সংযোগাভাবই মুক্তি। "যদ্বা তদ্বা তদুচ্ছিত্তিঃ পুরুষার্থঃ" (প্রবচন সূত্র ৬।৭০)। মোক্ষ হইলে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত ও একান্ত নিবৃত্তি হইয়া থাকে। ত্রিবিধ-দুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিই অত্যন্তপুরুষার্থ বা মুক্তি। আচার্য্য ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন যে, বন্ধন ও মুক্তি প্রকৃতিরই হয়। "তস্মান্ন বধ্যতেঽদ্ধা ন মুচ্যতে নাপি সংসরতি কশ্চিৎ। সংসরতি বধ্যতে মুচ্যতে চ নানাশ্রয়া প্রকৃতিঃ।" —সাং কারিকা।

প্রকৃতি-পুরুষের বিবেক জন্মিলে ভোগাদির কারণ কর্ম্মাশয় আর থাকে না (দগ্ধকর্ম্মাশয়)। এই অবস্থাকে জীবন্মুক্তি বলে। ভোগের দ্বারা প্রারব্ধের ক্ষয় হইলে, শরীর পাত হইলে ঐকান্তিক কৈবল্য লাভ হয়। কিন্তু প্রারব্ধ সমাপ্ত না হওয়া অবধি শরীর ধারণ করিয়া থাকিতে হয়। —সাংখ্যকারিকা (৬৮) এই কথা বলিয়াছে। এই অবস্থাকে বিধেয় মুক্তি বলে।

পাতঞ্জল-দর্শন ও সাংখ্যমতে দার্শনিক দৃষ্টির কোন ভেদ নাই। চিত্তের বৃত্তি নিরুদ্ধ করার নাম যোগ। 'যোগশ্চিত্তবৃত্তি-নিরোধঃ।' (পাত, সূত্র ১২) যোগ আর সমাধি একই কথা। অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি অবস্থায় চিত্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন পুরুষ

স্ব-স্বরূপে স্থিত হয়। যোগশাস্ত্রে ইহাকে কৈবল্য মুক্তি কহে। 'তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্।' (পাতঃসূত্র ১।৩)।

সাংখ্য-পাতঞ্জলে মুক্তির নাম কৈবল্য কৈবল্য অর্থ দ্রষ্টার চিরতরে স্বরূপে, কেবল বা সকল সঙ্গরহিত হইয়া, অবস্থান। সাংখ্য ও যোগের কৈবল্য অবস্থাতেও কোন আনন্দের অভিব্যক্তি থাকে না। তৎ সম্বন্ধে আচার্য্যগণ বর্ণিত করেন এই আনন্দ বা সুখ প্রকৃতির ধর্ম্ম। প্রকৃতি-পুরুষের ভেদজ্ঞানই মুক্তি। প্রাকৃত ধর্ম্ম সুখ বা আনন্দ, তাহা পুরুষে থাকিতে পারে না। পুরুষের শুধু চৈতন্যময় অবস্থিতি ঘটে। ইহাই স্বরূপাবস্থিতি বা মুক্তি।

ন্যায়-বৈশেষিক মতে মুক্তি

ন্যায়সূত্রে গৌতম মুক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন—"তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ।" সর্ব্বপ্রকার দুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষ অর্থাৎ বিয়োগই মুক্তি। সকল দুঃখের কারণই জন্ম। মুক্তি হইলে আর জন্ম হয় না। মুক্তাবস্থায় আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়—

"স্বরূপৈক-প্রতিষ্ঠানঃ পরিত্যক্তোঽখিলৈর্গুণৈঃ।"

স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে প্রয়োজন, সকল প্রকার গুণশূন্য হওয়া। 'দুঃখ জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গঃ' (১।১)। ন্যায় মতে আত্মার নয়টি গুণ, মুক্তাবস্থায় একটি গুণও থাকে না। নয়টি গুণ যথা—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও সংস্কার। এই গুণগুলি শূন্য না হইলে দুঃখের পরম বিনাশ হয় না। আত্মার চতুর্দশ গুণের মধ্যে এই পাঁচটি উচ্ছেদ্য নহে—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, সংযোগ, বিভাগ। বাকী নয়টির উচ্ছেদ হয় মুক্ত আত্মার।

বৈশেষিক দর্শনেও মুক্তি সম্বন্ধে ঐরূপ কথা বলা হইয়াছে। 'অদৃষ্টজ শরীরের সঙ্গে সম্বন্ধই সংসার এবং উহার সহিত সম্বন্ধচ্ছেদই মুক্তি।'

মুক্তাবস্থায় সুখানুভূতি আছে কি-না ইহা লইয়া ভাষ্যকারেরা অনেক আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই—মুক্তাবস্থায় কোন সুখানুভূতি থাকে না। তাঁহাদের যুক্তি এই যদি মোক্ষে সুখাভিলাষের পরিত্যাগ না হয় তবে মোক্ষেও বন্ধন

আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কারণ, সুখের প্রতি অনুরাগও বন্ধন বলিয়াই গণ্য। মুক্তি সম্বন্ধে গৌতমের ও কণাদের মত একই—মুক্তাবস্থায় কোন সুখানুভূতি থাকে না। তবে এইরূপ মুক্তি লোকে কেন কামনা করিবে তাহা বুঝা কঠিন। দুঃখ-নিবৃত্তি হয়, কিন্তু সুখেরও তো নিবৃত্তি হইয়া যায়।

মীমাংসামতে—মুক্তি

জৈমিনির মীমাংসা-সূত্র স্বর্গপ্রাপ্তির কথাতেই পূর্ণ। মুক্তির কোনো প্রসঙ্গই দেখা যায় না। পরবর্ত্তী মীমাংসকেরা মুক্তির কথা তুলিয়াছেন। শাস্ত্র-দীপিকাকার বলেন, জগতের সহিত আত্মার সম্বন্ধ-বিলয় মোক্ষ। "প্রপঞ্চ-সম্বন্ধ-বিলয়ো মোক্ষঃ।" তিন প্রকার পদার্থের সহিত সম্বন্ধ পুরুষকে আবদ্ধ করে—শরীর, ইন্দ্রিয় ও ভোগ্যবস্তু। এই সম্বন্ধ তিনটির নাশ হইলে মোক্ষ হয়। অদ্বৈত বেদান্ত প্রপঞ্চ-বিলয়কে মোক্ষ বলিয়াছেন। মীমাংসকেরা প্রপঞ্চের সহিত সম্বন্ধ-বিলয়কে মোক্ষ বলিয়াছেন। জীব মুক্ত হইলেও প্রপঞ্চ বিদ্যমান থাকে। মুক্তাবস্থায় প্রপঞ্চ অর্থাৎ জগতের সহিত সম্বন্ধ-নাশ ঘটে। মীমাংসা মতে জীবজগৎ সত্য। সুতরাং জীবের মুক্তিতে জগতের বিলয় হয় না। প্রভাকর বলেন 'নিয়োগসিদ্ধিরের মোক্ষঃ।' ফলাকাঙ্ক্ষা-শূন্য হইয়া কর্ত্তব্য বুদ্ধিতে নিত্যকর্মানুষ্ঠানকে নিয়োগসিদ্ধি বলে। গীতায় ইহাকে নৈষ্কর্ম্ম সিদ্ধি বলিয়াছে। মীমাংসা মতেও মুক্তাবস্থায় সুখ দুঃখের বিলয় হয়। সুতরাং কোন সুখানুভূতি থাকে না। এ বিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিকের সঙ্গে মীমাংসক কুমারিল ভট্ট ও প্রভাকরের মত অভিন্ন।

আচার্য্য শংকর-মতে মুক্তি

শঙ্করমতে মোক্ষে জীব আপন স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। স্বরূপপ্রাপ্তি অর্থে বুঝিতে হইবে না যে কোন আগন্তুক ধর্ম্ম বা ধর্ম্মান্তর লাভ হয়। যাহা যাহার স্বরূপ, তাহা তাহাতে নিত্য বর্ত্তমান থাকে। স্বরূপের বিপর্য্যয়ে বস্তুর ধ্বংস হয়। জীবের স্বরূপে জীব নিত্যকাল অবস্থিত। অজ্ঞানবশতঃ উহা তিরোহিত বলিয়া মনে হয়। মোক্ষে অজ্ঞান-আবরণ চলিয়া যায়, তখন উহা আবির্ভূত বলিয়া মনে হয়। পারমার্থিক দৃষ্টিতে বন্ধন ও মুক্তি দুইই ভ্রান্তি। মুক্ত আত্মা পরব্রহ্মে একীভাব প্রাপ্ত হয়। লবণের টুকরা যেমন সমুদ্রে পড়িয়া গলিয়া যায়, সমুদ্রে সম্পূর্ণরূপে মিশিয়া যায় মুক্ত জীবও সেইরূপ পরব্রহ্মে লীন হয়। আচার্য্য শঙ্করের মতে মুক্ত জীব আর ব্রহ্ম একই কথা। শ্রুতি স্পষ্টই বলিয়াছেন —'পরং সাম্যমুপৈতি'। পরব্রহ্মই জীবের যথার্থ স্বরূপ। জীবের জীবভাব উপাধিকৃত। রজ্জুর জ্ঞান হইলে যেমন রজ্জুতে আরোপিত সর্পভাব দূর হইয়া যায়, এবং যথার্থরূপ অর্থাৎ রজ্জুরূপ প্রকাশ পায়, সেইরূপ আত্মজ্ঞান হইলে আরোপিত জীবভাব দূর হইয়া যায় এবং চিদ্রূপের অভেদোপলব্ধি হয়।

শঙ্কর মতে মুক্তি নিত্যসিদ্ধ। রামানুজ মতে মুক্তি সাধনলব্ধ। শঙ্কর বলেন যাহা সাধনলব্ধ তাহা জন্য বস্তু। জন্য-বস্তু বিনাশ-শীল। ইহাতে মুক্তি অনিত্য হইয়া পড়ে। শঙ্কর বলেন আত্মাই ব্রহ্ম এই জ্ঞানই মুক্তি। জীব সর্বাবস্থাতেই মুক্ত। রামানুজ বলেন জীব মুক্তাবস্থায়ও ব্রহ্ম নয়, ব্রহ্ম সম। রামানুজ বলেন বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিই মুক্তি। শঙ্কর বলেন উহা আপেক্ষিক মুক্তি মাত্র।

রামানুজ (বেদান্ত) মতে মুক্তি

রামানুজ বলেন আত্মা জ্ঞাতা, জ্ঞানস্বরূপ মাত্র নহেন। মোক্ষেও অহমর্থের অনুবৃত্তি থাকে। অহং নাশ হইলে আত্ম নাশ হইবে। সুতরাং মুক্ত পুরুষেরও অহন্তা বুদ্ধি থাকে। সুতরাং ব্যক্তিত্বও থাকে। অদ্বৈতবাদিগণ মুক্ত পুরুষের অহন্তা থাকে ইহা মানেন না। তাঁহারা বলেন অহন্তা অবিদ্যাত্মিকা। সুতরাং মুক্তিতে থাকে না। রামানুজ বলেন, অহমর্থে প্রত্যগাত্মার স্বরূপ। সুতরাং তাহা মুক্তিতেও থাকে। রামানুজ পরব্রহ্মকেও জ্ঞানস্বরূপ মাত্র স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, জ্ঞানৈকগম্য বলিয়া শ্রুতি তাঁহাকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াছেন।

জীব ও ব্রহ্ম উভয়ই চিদ্বস্তু। অতএব চিদংশে উভয়ের সাম্য আছে। এই সমতাহেতু জীব ও ব্রহ্মে অভেদ বলা হয়। ব্রহ্ম প্রভু, জীব তাঁর দাস—চির দাস। মুক্ত জীব দাসরূপে থাকিয়া তাঁহার লীলার সহচর হন।

ব্রহ্ম বিভু, জীব অণু, মুক্তাবস্থাতেও জীবের অণুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত সম্পূর্ণ অভেদ অসম্ভব। রামানুজ বলেন, ব্রহ্ম আশ্রয়, জীব আশ্রিত। এই আশ্রিত ভাবই দাসত্ব। এই দাসত্বের পূর্ণ বিকাশই মোক্ষ। মুক্ত জীব ভগবানের পূর্ণ সেবার অধিকার লাভ করেন। ঐরূপ মুক্তির পক্ষে পাঞ্চভৌতিক দেহ প্রতিবন্ধক হওয়ায়—রামানুজ জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন নাই। অন্যান্য বৈষ্ণবাচার্য্যেরা মুক্তি বিষয়ে রামানুজের সহিত প্রায়ই একমত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যেরা সাযুজ্য মুক্তিকে তুচ্ছ বলিয়াছেন, হেয় করিয়াছেন। কারণ ঐ মুক্তিতে সেবানুরক্তি থাকে না।

ন্যায়দর্শনে আত্মা

. প্রমাণ প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শটী পদার্থ ন্যায়দর্শনে স্বীকৃত। তন্মধ্যে আবার প্রমেয় দ্বাদশটি। প্রমেয়-তত্ত্বের মধ্যে আত্মার স্থান প্রথম। আত্মাকে জানিতে হইবে। জানিতে প্রথম চাই প্রমাণ। আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধে শব্দ-প্রমাণ আছে। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ" এই বেদবাক্য আত্মা সম্বন্ধে প্রমাণ। অনুমান প্রমাণ দ্বারাও আত্মাকে স্থাপন করা যায়।

রাগ, দ্বেষ, ইচ্ছা, জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, এই সকল অশরীরী, এইগুলি স্থির নহে, সর্বদা চঞ্চল, পরিবর্ত্তনশীল। একজন ব্যক্তি কখনও সুখী কখনও দুঃখী, কখনও অনুরাগযুক্ত, কখনও বা বিরাগযুক্ত। সুতরাং এইগুলি কোন দ্রব্য নহে। এইগুলি কোন দ্রব্যের গুণবিশেষ। যে বস্তুর বা দ্রব্যের এই সকল গুণ, সেই বস্তুই হইল আত্মা।

আত্মাকে প্রত্যক্ষও করা যায়—মহাযোগীরা আত্মাকে প্রত্যক্ষ করেন। উদ্যোতকর বলেন, আত্ম. সকলেরই প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয়। আমরা যে আমি আমি করি এই আমি-পদবাচ্য বস্তুই আত্মা। আমার অন্য অনুভূতিগুলি পরিবর্ত্তনশীল কিন্তু আমি এই অনুভূতি স্থায়ী। প্রত্যক্ষভাবেই আমি আমাকে জানি। যদি আমি এই অনুভূতি পরিবর্ত্তনশীল হইত, তাহা হইলে অতীতের স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞান, কোন মানুষকে পূর্ব্বে দেখিয়া পরে চেনা—কিছুই সম্ভব হইত না। আত্মা স্থির বস্তু না হইলে

অন্য আত্মার সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের জ্ঞানও সম্ভব হইত না। একজন একটা বস্তুকে দেখিতে ইচ্ছা করিল, তারপর দেখিতে চেষ্টা করিল, তারপর দেখিল, তারপর ভাবিল, এই সেই বস্তু। দেখিতে ইচ্ছা, চেষ্টা, দেখা ও মনে করা এই সেই, সকলই একজন সাধারণ কর্ত্তার কার্য। সুতরাং জ্ঞানমাত্রই এক স্থায়ী আত্মার সত্তায় প্রমাণ।

জড়বাদীর মতে চেতনা দেহের ধর্ম্ম। নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ অতি সূক্ষ্ম বিচারের দ্বারা ঐ মত খণ্ডন করিয়াছেন। যদি চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইত তাহা হইলে উহা দেহের সর্ব্বত্রই থাকিত। দেহের প্রত্যেক অবয়বেরই চেতনা থাকিত। তাহা হইলে দেহ-চৈতন্য হইত অনেকগুলি চৈতন্যের সমষ্টি। কিন্তু চৈতন্য সম্বন্ধে ঐরূপ অনুভব হয় না।

যদি দেহের চৈতন্য থাকিত তাহা হইলে ইহার উপাদানগুলি—মাটি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ—ইহারাও চেতনা বিশিষ্ট হইত। সেরূপ দৃষ্ট হয় না। যদি চৈতন্য দেহের ধর্ম হইত তাহা হইলে দেহের বিনাশে আর চেতনা থাকিত না। যদি চেতনা না থাকিত তাহা হইলে নৈতিক জীবন অর্থহীন হইত। পাপ বা পুণ্যকারীর ফলের ভোক্তা কেহ থাকিত না। লোকেও ইচ্ছামত যে কোন অন্যায় কার্য্য করিত, কারণ মৃত্যুর পরে তাহার ফলভোক্তা কেহ নাই। ইহা হইলে নীতিশাস্ত্রও নিরর্থক হইত। আপাতসুখ বলিয়া লোকে কদাকারেই আকৃষ্ট হইত। ক্ষণিকবাদকে খণ্ডন করিতে গিয়া নৈয়ায়িক পণ্ডিতেরা বলিয়াছেন—ক্ষণিকবাদ সত্য হইলে নীতিশাস্ত্র ব্যর্থ হইয়া যায়। দেহ প্রত্যেকদিন

প্রত্যেক ক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইলে দেহকৃত পাপ পরবর্ত্তী জীবনে চলিয়া যাইবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। আর পাপ যদি চেতনাযুক্ত আত্মায় বর্ত্তে ও আত্মা মরণশীল না হয় তাহা হইলেই নীতির শিক্ষা, নৈতিক জীবন অর্থপূর্ণ হয়।

চেতনা যদি দেহের স্বভাব হইত তাহা হইলে চেতনা কদাপি দেহকে ছাড়িত না। তাহা হইলে মৃতদেহেও চেতনা থাকিত। একটা দেহের দৈর্ঘ্য, ওজন, বর্ণ যেমন কখনও তাহাকে ত্যাগ করে না, তদ্রূপ চৈতন্য দেহের ধর্ম্ম হইলে তাহা কখনও দেহকে ছাড়িত না। মানুষ কখনও অচেতন হইত না।

যদি কেহ বলেন, চেতনা দেহের নিজস্ব স্বরূপ নহে, আগন্তুক ধর্ম (accidental property), তাহা হইলে বলিতে হইবে উহা দেহের বাহির হইতে আসিয়াছে। তাহা হইলে চেতনার মূল দেহ নহে। বাহিরের যে বস্তু হইতে আসিয়াছে তাহা।

চেতনা যদি দেহের ধর্ম হইত তাহা হইলে অন্য ব্যক্তি যিনি দেহকে দেখেন, তিনি চেতনাকেও দেখিতে পাইতেন।

এই মাত্র বলা চলে যে চেতনা দেহের একটা যন্ত্র (instrument) বিশেষ, যাহা দ্বারা দেহ তাহার ও তাহার ভিতরে অনেক অবস্থানকে জানিতে ও প্রকাশ করিতে পারে। চেতনার সঙ্গে দেহের সম্বন্ধ নাই। কেবল দেহের মাধ্যমে অন্তরে যে চেতনা আছে তাহা ব্যক্ত হয়। চেতনা আত্মার ধর্ম। আত্মার সঙ্গেও দেহের কোন সম্বন্ধ নাই। দেহ হইল ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার ও বস্তুর বাহক মাত্র। দেহের মাধ্যমে আত্মা কোন বস্তুকে গ্রহণ বা বর্জন করিতে পারে, এই মাত্র।

চেতনা প্রাণশক্তির গুণও নহে। কারণ জীবন বা প্রাণশক্তি আর কিছু নহে—উহা দেহ ও আত্মার একটা বিশেষ প্রকার সম্বন্ধের নাম। আত্মা ইন্দ্রিয় নহে ইন্দ্রিয়গণের প্রভু। আত্মা পারে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিতে। আত্মা পারে বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের দানকে একত্র করিতে। যখন কেহ বলে দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছি—তখন বুঝিতে হইবে দেখা চক্ষুর কাজ, শোনা কানের কাজ, বুঝা মনের কাজ, এই তিন ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকে একত্র করিয়াছে—আত্মা। আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে ন্যায়দর্শন নিজস্ব যুক্তি সকল তো উপস্থিত করিয়াছেই—বৈশেষিক দর্শনের সকল যুক্তিও গ্রহণ করিয়াছে।

ন্যায়শাস্ত্র, আত্মা সম্বন্ধে আর একটি বিচিত্র কথা বলিয়াছে। চৈতন্য আত্মার নিজস্ব স্বভাব নহে। দেহের সঙ্গে যুক্ত থাকায় আত্মাতে চেতনার প্রকাশ হয়। মনের সাহায্যে আত্মা নিজের অন্তরের বিষয় ও বাহিরের জগতের বিষয় সম্বন্ধে সচেতন হয়। দেহ ও মনের সঙ্গে যুক্ততা না থাকিলে আত্মা চেতনাহীন। এই কথা বিশেষভাবে বিচারযোগ্য। এই বিচার এখানে করিব না—শুধু এইটুকু মাত্র বলিব যে—দেহ মনের সম্পর্ক-শূন্য আত্মা যখন, তখন তাহা মুক্ত আত্মা। মুক্ত আত্মা সম্পূর্ণভাবে অচেতন। এই অচেতন অবস্থা ঘুচিবার কোন সম্ভাবনা নাই। কেহ কেহ সুষুপ্তির সঙ্গে এই অবস্থার তুলনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ ইহা সুষুপ্তি অবস্থা নহে—এই অবস্থা একটি ইষ্টকের অবস্থার মত। এই মুক্তি কেন লোকে কামনা করিবে? অথচ সকলেই মুক্তি কামনা করে। ইহাতে বুঝা যায় কোথাও হিসাবে গরমিল আছে। নৈয়ায়িকদের

সকল বিচারযুক্তিই সুন্দর। কেবলমাত্র মুক্ত আত্মার অবস্থা ভয়াবহ—বৌদ্ধধর্ম্মের নির্ব্বাণ হইতেও ভীতিপ্রদ। বৌদ্ধ মতকে খণ্ডন করিতে গিয়া নৈয়ায়িকরা মুক্তির বেলায় যেন বৌদ্ধ মতকে প্রায় গ্রহণ করিয়া ফেলিয়াছেন।

আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব—বৈশেষিক দর্শন

বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের কোন প্রাধান্য নাই। কণাদসূত্রে ঈশ্বরের নাম নাই। কনাদ বেদ মানিয়াছেন। বেদের প্রামাণ্য-মানিয়াছেন। "তদ্‌বচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যম্—এইরূপ সূত্র করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বেদকে ঈশ্বরকৃত মনে করেন না। তিনি মনে করেন, বেদ ঋষিগণকৃত। 'তদ্বচনাৎ' অর্থ ঋষিবাক্য হইতে। অসংখ্য পরমাণু ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই দ্ব্যণুকাদিরূপে পরিণত হইতেছে। মাটি কি করিয়া ঘট হইল ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়া—ইহা কণাদ চিন্তা করেন নাই। অসংখ্য পরমাণু—অসংখ্য জীবাত্মা—অসংখ্য জীবের অসংখ্য প্রকার অদৃষ্ট ইহা দ্বারাই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি লয়, এই শৃঙ্খলার সদ্‌ব্যাখ্যান হইতে পারে—ইহাই তিনি মনে করিয়াছেন। কণাদদর্শনে অদৃষ্ট কথাটার বহুবার উল্লেখ থাকিলেও ইহা দ্বারা কি বুঝা যায় তাহা তিনি স্পষ্ট করেন নাই। অদৃষ্ট অর্থ নিজের কর্ম্মফল। অসংখ্য জীবের অসংখ্য প্রকার কর্ম্মফল। ইহা যে বিশ্বের সৃজন পালন কার্য্যের সহায়ক তাহা ভাবনা করা যায় না। পরবর্ত্তী কালে কণাদের ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ ঈশ্বর মানিয়াছেন ও সৃষ্টির কারণ রূপে ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যের আরম্ভে ও শেষে প্রশস্তপাদ ঈশ্বরের নাম করিয়াছেন। কিন্তু সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বরের বিশেষ স্থান দেন নাই। অসংখ্য পরমাণু ও অসংখ্য জীবাত্মাকে নিত্য বলা হইয়াছে। ভগবান্ ইহাদের সৃষ্টি-কর্ত্তা নহেন। Aristotle-এর prime-mover-এর মতো ঈশ্বর হয়ত প্রথম আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—কিন্তু পরমাণু ও জীবাত্মার ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঈশ্বরের কোন স্থান নাই। সৃষ্টি চলাকালে ঈশ্বর আর কিছু করিতে পারেন না। বেদান্ত-সূত্র-ভাষ্যে আচার্য্য শঙ্কর বৈশেষিক দর্শনকে নিরীশ্বর বলিয়া খণ্ডন করিয়াছেন।

ঈশ্বরতত্ত্ব—ন্যায়দর্শন

ন্যায়সূত্রকার গৌতম সূত্রমধ্যে ঈশ্বরের কোন স্থান দেন নাই। প্রমাণ-প্রমেয় প্রভৃতি ষোড়শটি পদার্থ। তন্মধ্যে প্রমেয় দ্বিতীয় পদার্থ। প্রমেয় আবার দ্বাদশবিধ। দ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থের মধ্যে—আত্মা একটি পদার্থ। আত্মা দুই প্রকার জীবাত্মা ও পরমাত্মা, ইহা ভাষ্যকার বলিয়াছেন। পরমাত্মা সব জানেন সব দেখেন সব পারেন—এ কথাই বলা হইয়াছে। সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের স্থান কোথায়—এ বিষয়ে ভাষ্যকারও নীরব। যে পরমাত্মা সবই করিতে পারেন, তিনিও পরমাণু ও জীবাত্মাকে সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাহা মানিলে ন্যায়-দর্শনের রূপ বদলাইয়া যায়। পরবর্ত্তী কালে শ্রীউদয়নাচার্য ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরকে কর্ম্মফল-প্রদাতৃরূপে মানিয়াছেন। কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব (personality) আছে। তাঁহার সত্তা আছে, জ্ঞান আছে ও আনন্দ আছে—তাঁহাতে অধর্ম্ম, মিথ্যাজ্ঞান ও প্রমাদ নাই।

ঈশ্বরতত্ত্ব—সাংখ্য-দর্শন

সাংখ্য-দর্শনকে তুই ভাগ করা হয়, নিরীশ্বর সাংখ্য ও সেশ্বর সাংখ্য। কপিলের সাংখ্য, নিরীশ্বর সাংখ্য। পতঞ্জলির যোগদর্শনকে বলা হয় সেশ্বর সাংখ্য। কপিলের সাংখ্যকে নিরীশ্বর বলা হয় কারণ তিনি ঈশ্বর মানেন নাই। মানেন নাই কি অর্থে তাহা বলিতেছি। তিনি ঈশ্বর নাই এমন বলেন নাই কোথায়ও। ঈশ্বরকে যুক্তি দ্বারা স্থাপন করা যায় না, ইহা বলিয়াছেন। কপিলের সূত্র—"ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" ঈশ্বরকে প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না। যুক্তির ক্ষমতা নাই ঈশ্বরকে প্রমাণ করে। তিনি 'ঈশ্বরাভাবাৎ' অর্থাৎ ঈশ্বর নাই—এরূপ সূত্র লিখেন নাই। ঈশ্বরকে যুক্তির দ্বারা স্থাপন করা যায় না, ঈশ্বরের ভক্তরাও বলেন। ভক্তরা বলেন—ঈশ্বরকে কৃপায় জানা যায়। জ্ঞানীরা বলেন, ঈশ্বরকে বেদ প্রমাণ হইতে জানা যায়। কপিল এরূপ কোন কথা বলেন নাই। ভাগবতে কপিলের নাম আছে। তিনি বিষ্ণুর অবতার। তিনি তাঁহার মা দেবহূতিকে অনেক ধর্ম উপদেশ দিয়াছিলেন। সেখানে সকলই জ্ঞান-মিশ্রা ভক্তিবাদের কথা। সাংখ্য-শাস্ত্রীয় তত্ত্বসমূহও সেখানে উপস্থাপিত করা হইয়াছে। সেখানে তিনি ভগবান্‌কে বিশেষভাবে মানিয়াছেন। এই তুই কপিল এক কিনা এ বিষয়ে সংশয় আছে। একই ব্যক্তি এক জায়গায় ভগবান্ মানিয়াছেন আর জায়গায় মানেন নাই, ইহা ভাবিতে অসুবিধা হয়। আবার এইরূপ হইতে পারে যে, একই ব্যক্তি যেখানে ভক্তি প্রীতির কথা বলিয়াছেন সেখানে

তাঁহাকে মানিয়াছেন। যেখানে যুক্তির কথা বলিয়াছেন সেখানে যুক্তি দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না, এরূপ বলিতে পারেন। কোন ভক্ত যদি অঙ্ক শাস্ত্রের বই লিখেন ও তাহার মধ্যে ঈশ্বর প্রসঙ্গ না করেন তবে তিনি ঈশ্বর মানেন নাই, এরূপ বলা যায় না।

সাংখ্য-শাস্ত্রে কপিল দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে যুক্তি বিচার দ্বারাই এই সৃষ্টি সংসারের সৃষ্টি-ব্যাখ্যা চলে। কোন শাস্ত্রের নির্দেশ বা ঈশ্বর না মানিলেও চলে। সাংখ্যের বিচার-নৈপুণ্য নিরুপম। মাত্র দুইটি বস্তু, প্রকৃতি ও পুরুষ স্বীকার করিয়া তিনি নিখিল বিশ্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতা-শাস্ত্রও এই দুইটি বস্তুকে মানিয়াছেন। সমগ্র সাংখ্যকে গীতা গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ কথা বলা চলে না। তবে গীতা বিশেষভাবে ঈশ্বরবাদী। গীতা বলিয়াছেন, প্রকৃতি পুরুষ বস্তু দুইটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে। দুইটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ বস্তু থাকিতে পারে না। স্বয়ং-সম্পূর্ণ বস্তু আছে মাত্র একটিই, তিনি ঈশ্বর। প্রকৃতি ও পুরুষ তাঁহার দুইটি বিভাব মাত্র—এই কথা গীতা বলিয়াছেন।

যোগদর্শনে—ঈশ্বরতত্ত্ব

পতঞ্জলির যোগদর্শনকে সেশ্বর সাংখ্য বলে। সাংখ্য হইতে যোগদর্শনের প্রধান বৈশিষ্ট্য ঈশ্বর স্বীকারে। ঈশ্বরের প্রসঙ্গ আসিয়াছে এইরূপে—ঈশ্বরে প্রণিধান বা ভক্তিবিশেষ হইতে যোগীর আসন্নতম সমাধি লাভ হয়। এই কথার পর অর্থাৎ 'ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা' (সূঃ ১।২৩॰) এই সূত্রের পর সূত্রকার ঈশ্বরের পরিচয় দিতেছেন—

"ক্লেশকর্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ
পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ॥" (সূত্র ১।২৪)

অবিদ্যাদি ক্লেশ, কর্ম্মাশয় এইগুলির সঙ্গে ত্রিকালেই যার সম্পর্ক নাই, সেই পুরুষ-বিশেষ ঈশ্বর। "তত্র নিরতিশয়ং সর্বজ্ঞ-বীজম্" তিনি নিরতিশয় সর্ব্বজ্ঞ। লোকে দেখা যায়, ইঁহার অপেক্ষা উনি বেশী জানেন, এইরূপ তারতম্য। কিন্তু ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্বাতিশায়ী। তাঁহার বাচক হইতেছে প্রণব। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।" এই সূত্রগুলিতে পতঞ্জলি বলিয়াছেন—তিনি সর্বজ্ঞ, তাঁহার নাম প্রণব। তাঁহার জপ ও চিন্তা করিলে যোগবিঘ্ন দূর হয়। তিনি কৃপা করিয়া যোগীকে ইষ্টোন্মুখী করিয়া দেন।

ভাষ্যকার ব্যাসদেব ভাষ্যে ভালভাবেই যুক্তিতর্ক দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। তিনি ঈশ্বরকে প্রকৃষ্ট সত্ত্ব অর্থাৎ পূর্ণতম এরূপও বলিয়াছেন। তাঁহার সমান বা তাঁহার চেয়ে বড় কেউ নাই এইরূপ লিখিয়াছেন (তিনি অসমোর্দ্ধ)।

মনে হয় পতঞ্জলি ঈশ্বরে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী উভয়ের জন্যই যোগসূত্র লিখিয়াছেন। বৌদ্ধেরা ঈশ্বর মানিতেন না। তবে চিত্তকে সমাহিত করা তাঁহারাও আবশ্যক মনে করিতেন। যাহারা ঈশ্বরভক্ত তাঁহারা ঈশ্বরে চিত্ত স্থাপন করিবেন। এই ঈশ্বর সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা কিনা বা দয়াময় প্রেমময় কিনা, এ সম্বন্ধে পতঞ্জলি নীরব।

সাংখ্য-দর্শনে আত্মতত্ত্ব

যেখানেই জীবন আছে সেইখানেই আত্মা আছে। আত্মা বহু, এক নহে। দেহভেদে আত্মা ভিন্ন। এবিষয়ে ন্যায়-বৈশেষিক যে সকল যুক্তি উপস্থাপন করিয়াছে, সাংখ্যও তাহাই করিয়াছে। সব আত্মাই মুক্ত হইলে একই রূপ। বদ্ধ হইলেই তাহাদের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যে আত্মা যেরূপ দেহ ধারণ করিয়াছে তাহার উপর নির্ভর করে সেই আত্মা কতখানি অজ্ঞতার আবরণে আছে তাহা। সাংখ্যদর্শনে আত্মার নামই পুরুষ। যে তাহাকে আবৃত করে, বদ্ধ করিয়া বন্ধন করে ও ত্রিতাপে জারিত করে, আবার বিবেকজ্ঞানের বিকাশ ঘটাইয়া কৈবল্যও দান করে, তাহার নাম প্রকৃতি। বস্তুতঃ প্রকৃতি পুরুষকে বন্ধন করে না। অবিবেক-বশতঃ পুরুষ যদি আপনার স্বরূপ ভুলিয়া নিজেকে প্রকৃতি মনে করে, তখনই তাহার বন্ধন আরম্ভ হয় এবং সে-বন্ধনজন্য সে দুঃখের সমুদ্রে পতিত হয়। আবার যে মুহূর্তে বিবেক উদিত হয় —মনে হয় আমি প্রকৃতি হইতে ভিন্ন, আমি পুরুষ শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তখনই তাহার বন্ধন ঘুচাইয়া স্ব-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া দেয় প্রকৃতি স্বয়ং। বস্তুতঃ পুরুষের বন্ধন সত্য নহে। তাই তাহার মুক্তিও সত্য নহে। সে নিত্যমুক্ত। প্রকৃতির সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ অনাদি-অজ্ঞান-জনিত।

পুরুষ বা আত্মা যে আছে সে বিষয় প্রমাণ—(১) যে বস্তু কতগুলি বস্তুর সমষ্টি দ্বারা গঠিত অর্থাৎ যে বস্তু সংঘাত, তাহার সত্তা সর্ব্বদাই অন্যের জন্য। "সংঘাতপরার্থত্বাৎ" (সাংখ্য-কারিকা)।

গৌড়পাদ শয্যার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একখানি শয্যা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নহে (সংঘাত), তাই তাহা পরার্থ, অর্থাৎ অপর কাহারও শয়নের জন্য। পঞ্চভূতাত্মক এই বিশ্বসংসারও স্বয়ংসম্পূর্ণ নহে। কাহারও ভোগের জন্য ইহার সত্তা। এই দেহ পঞ্চেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধি দ্বারা গঠিত—এই দেহ সংঘাত, স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে। ইহা কাহারও ভোগের জন্য কল্পিত। সেই ভোক্তাই পুরুষ বা আত্মা। ভোগের আয়তন হইল দেহ।

২। জ্ঞেয় বস্তু সকলই ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং গুণাতীত কোন দ্রষ্টা নিশ্চয়ই আছেন। 'ত্রিগুণাদিবিপর্যয়াৎ'—সাংখ্য-কারিকা। এই দ্রষ্টাই পুরুষ।

৩। খণ্ড খণ্ড অনুভূতিগুলিকে একত্র গ্রথন করিয়া একটি অনুভূতিতে পরিণত করিবার জন্য নিশ্চয়ই একটি কর্তৃত্ববিশিষ্ট শক্তি আছে। এই শক্তিই চৈতন্যময় পুরুষ ('অধিষ্ঠানাৎ' সাং.কা.।

৪। প্রকৃতি নিজে চৈতন্যহীনা। সুতরাং প্রকৃতির পরিণাম-গুলিকে অনুভব করিবার জন্য একটি প্রকৃতির অতীত চেতন সত্তা চাই। সেই সত্তাই পুরুষ ('পুরুষোঽস্তি ভোক্তৃভাবাৎ'—সাং.কা.)।

৫। কৈবল্যলাভের একটি প্রবল প্রচেষ্টা সকল জীবের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। প্রকৃতির বন্ধন সে কাটাইয়া উঠিতে চায়। ইহাতেই বুঝা যায় যে প্রকৃতির বিপরীতধর্মী কেহ আছে। যে দুঃখময় অবস্থায় মানুষ আছে তাহা হইতে পলাইয়া গিয়া একটি সুখময় আনন্দময় সত্তায় পৌঁছিতে একান্ত লালসা সকলের মধ্যে দৃষ্ট হয়। "কৈবল্যার্থং প্রবৃত্তেশ্চ"—সাংখ্যকারিকা। ইহা দ্বারা

বুঝা যায় কেহ নিশ্চয়ই আছে যে পলায়নে কৃতকার্য্য হইতে পারে। সেই সত্তাই পুরুষ সত্তা।

পঞ্চভূতের কাহারও চেতনা নাই। সুতরাং তাহাদের সমষ্টিতেও চেতনা নাই। ইন্দ্রিয়েরও চেতনা নাই। কারণ ইন্দ্রিয় করণ, কর্ত্তা নহে। ইন্দ্রিয় তদ্‌গ্রাহ্য বস্তুকে রূপ দিয়া বুদ্ধির কাছে আনিয়া দেয়। বুদ্ধিও অচেতন। বুদ্ধি আত্মার কাছে আনিয়া দেয়। আত্মা সেইগুলিকে জ্ঞেয় বস্তুতে পরিণত করে। কারণ আত্মা চৈতন্যময়। চৈতন্যময় পুরুষ না থাকিলে কোন জ্ঞানই সম্ভব হইত না।

পুরুষের স্বভাব হইল "সদাপ্রকাশস্বরূপতা"। সকল চিন্তার রাজ্য, অনুভূতির রাজ্য পুরুষই আলোকিত করে। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি, ত্রিবিধ অবস্থাতেই পুরুষের চৈতন্যের আলোক প্রকাশমান থাকে। তাহা না হইলে স্বপ্ন-সুষুপ্তিকে আমরা জানিতে পারিতাম না।

পুরুষের কোন গুণ নাই। কোন কার্য্য নাই। ইনি গুণাতীত কর্মাতীত বলিয়াই "শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবঃ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সুঃখ-দুঃখ কিছুই আত্মার গুণ নহে। আত্মার মুক্তি অর্থ কোন ভূমা বস্তুর সঙ্গে একাত্মতা নহে। মুক্তি অর্থ প্রকৃতি ও তাহার সকল প্রকার পরিণাম হইতে সুদূরে সরিয়া যাওয়া। সরিয়া গিয়া পুরুষ প্রকৃতির সকল কার্য্যের নীরব দ্রষ্টা রূপে অবস্থান করে। সাংখ্যে মুক্তির নাম কৈবল্য। কেবলের ভাব onliness, loneliness। কৈবল্য অর্থ কোন অবস্থান্তর-প্রাপ্তি নহে। ইহা নিজ স্বরূপে অবস্থান, প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম। অনাদি

হইলেও অজ্ঞান, বিবেক-বলে বিনাশপ্রাপ্ত হয়। তখন আত্মা কেবলত্বে স্থিত হয়।

বেদান্তের আত্মার সহিত সাংখ্যের পুরুষের অনেক সাদৃশ্য আছে। উভয়েই আদিহীন, অন্তহীন, সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত-কাল দ্রষ্টা রূপে স্থিত। আত্মা ইন্দ্রিয়াতীত মনোবুদ্ধির অতীত, দেশকাল, কারণ পরম্পরার উর্ধ্বে স্থিত। আত্মা সৃষ্টও নহে স্রষ্টাও নহে। আত্মার নিত্যত্ব অর্থ শুধু মৃত্যুহীনতা নয়। ইহা অপরিবর্ত্তনীয়, পূর্ণ ও চিদ্রূপ।

অমূর্ত্ত শ্চেতনে ভোগী নিত্যঃ সর্ব্বগতোঽক্রিয়ঃ।
অকর্ত্তা নির্গুণঃ সূক্ষ্ম আত্মা কাপিলদর্শনে॥

পুরুষ, প্রকৃতির বিপরীত-ধর্ম্মী। প্রকৃতি অচেতনা, পুরুষ চেতন। প্রকৃতি কর্ত্তা ক্রিয়াশীলা। পুরুষ অকর্ত্তা স্থির দ্রষ্টা। পুরুষ অপরিণামী নিত্য। প্রকৃতি পরিণামী নিত্য। প্রকৃতি গুণময়ী, পুরুষ গুণাতীত। পুরুষ জ্ঞাতা, প্রকৃতি জ্ঞেয়।

সাংখ্যের বহু অভ্যুপগমই বেদান্তের অভিমত। কারণ উভয়েই শ্রুতির অর্থাৎ উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করে। কেবল পুরুষ প্রকৃতির দ্বৈতবাদ ও পুরুষ-বহুত্ব গ্রহণ করিতে বৈদান্তিকের মন অনিচ্ছুক।

যদি কোন প্রকারে পুরুষ-প্রকৃতি মিলিত হইয়া এক হইয়া যায় আর যদি বহু পুরুষ কোন প্রকারে একপুরুষে পরিণত হয় তাহা হইলে বেদান্তের সঙ্গে সাংখ্যের একতা হইয়া যায়।

যোগদর্শনে আত্ম-সাধনা

আত্মা সম্বন্ধে ভাবনা কপিল পতঞ্জলির একই। পতঞ্জলি সাধনার কথা বলিয়াছেন। উহা আর কোন দর্শন বলেন নাই। সাংখ্যাদি শাস্ত্র দর্শন, কিন্তু পতঞ্জলি দর্শন নহে, বিজ্ঞান। সম্পূর্ণ-ভাবে আত্মস্বরূপে স্থিত হইতে হইলে যোগীর পৌঁছিতে হইবে সমাধিতে। সবীজ হইতে ক্রমে নির্বীজ সমাধিতে, অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে। ইহা চরম সীমার কথা।

যোগের আটটি অঙ্গ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান, সমাধি। এই যোগাঙ্গের প্রথম পাঁচটি বহিরঙ্গ, শেষের তিনটি অন্তরঙ্গ। প্রথম দুইটি যম ও নিয়ম। ইহাদের উদ্দেশ্য পবিত্র নৈতিক চরিত্র গঠন।

যম পাঁচ প্রকার—অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্যাপরিগ্রহাঃ। অহিংস হইতে হইবে। কাহারও প্রতি বিন্দুমাত্র বৈরিভাব রাখা চলিবে না। সত্যবাদী হইতে হইবে, কোন মিথ্যার সম্পর্ক জীবনের কোন স্তরে থাকিবে না। রাগ, দ্বেষ, লোভ, ঈর্ষ্যা শূন্য হইতে হইবে। এই সকল স্থিরভাবে পালন করিতে করিতে বিষয়-বৈরাগ্য আসিবে। চিত্ত সর্ব্বপ্রকার কামনাশূন্য হইবে। ইহকালের কোন সুখ কামনা তো থাকিবেই না, পরকালে স্বর্গাদির সুখের বাসনাও দূর হইয়া পড়িবে। ইহা হইল যোগমার্গে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতি। যতক্ষণ তমোগুণ আছে ততক্ষণ চিত্ত ক্ষিপ্ত বা মূঢ়। যতক্ষণ রজোগুণ, চিত্ত বিক্ষিপ্ত। রজস্তমোগুণের ঊর্দ্ধে উঠিয়া সত্ত্বগুণে স্থিত হইলে চিত্ত একাগ্র বা একবিষয়ে

সমাহিত হয়। তখন হয় যোগসাধনায় প্রবেশের পথ শেষ। এইটি সম্প্রজ্ঞাত যোগ।

চিত্তের পাঁচটি ভূমির কথা বলা হইল ক্ষিপ্ত মূঢ় বিক্ষিপ্ত একাগ্র ও নিরুদ্ধ। প্রথম তিনটিতে যোগ হয় না। একাগ্র চিত্তে হয় সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বা সবীজ সমাধি। অসংপ্রজ্ঞাত যোগ হয় চিত্তের নিরুদ্ধ ভূমিতে। কিছুরই জ্ঞান তখন থাকে না। ন কিঞ্চিদপি সম্প্রজ্ঞায়তে ইত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ ইতি ব্যাসভাষ্যম্। এই দুইটি যোগই চিত্তের ধর্ম্ম।

সম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে চিত্তের রাজস তামস বৃত্তিগুলিই নিরুদ্ধ হয়। অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় সাত্ত্বিক চিত্তবৃত্তিগুলিও নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। একটি যোগীর চরম লক্ষ্য। এইটি নির্বীজ সমাধি।

পূর্ব্বমীমাংসা-দর্শনে আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব

পূর্ব্বমীমাংসা সর্ব্বতোভাবেই বেদভিত্তিক। বৈদিক দেবতাগণকে পূর্ব্বমীমাংসা স্বীকার করে কিন্তু দেবতার ঊর্ধ্বে একজন, পরমেশ্বর আছেন, ইহা স্বীকার করে না। জৈমিনি যে ঈশ্বরতত্ত্বকে কোন যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন তাহা নহে। তিনি পরমেশ্বর সম্বন্ধে কোন আলোচনাই করেন নাই। এ প্রসঙ্গে নীরবে পরিহার করিয়া গিয়াছেন।

বেদসংহিতার প্রধান কথা হইল যজ্ঞ। সংহিতার মন্ত্রে যে যজ্ঞের বিশেষ কোন কথা আছে তাহা নহে। মন্ত্রগুলির বিনিয়োগ হইবে যজ্ঞে, এই কথা ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। কোন যজ্ঞের কোন্ বিশেষ কার্য্যে কোন্ মন্ত্রের বিনিয়োগ তাহা ব্রাহ্মণভাগে শ্রৌতসূত্রে বিস্তৃতভাবে উক্ত আছে। যজ্ঞে প্রদত্ত হবি দেবতারা গ্রহণ করেন। দেবতাদের মুখ হইলেন অগ্নি। 'অগ্নির্মুখং প্রথমো দেবতানাম্।' যে দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া যাহা দেওয়া হয় তাহা অগ্নিমুখে সেই দেবতা গ্রহণ করেন। কোন্ যজ্ঞ কিভাবে করিতে হইবে তাহা বেদ শ্রৌতসূত্রে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যথাযথভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান করিলে তাহার শাস্ত্রনির্দিষ্ট ফল ফলিবেই। এই ফল প্রদানের জন্য কোন কর্ম্মফলদাতা পরমেশ্বর পরিকল্পনা নিষ্প্রয়োজন।

ঈশ্বর না মানিলে আমরা সাধারণতঃ তাহাকে নাস্তিক বলি কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসাকার জৈমিনি ঈশ্বর না মানিলেও নাস্তিকপদবাচ্য নহেন। কেন না তিনি বেদ মানিয়াছেন। বিশেষতঃ বেদপ্রতিপাদ্য পরলোক মানিয়াছেন। পরলোক যে মানে সেই

আস্তিক। "অস্তি নাস্তি দিষ্টং মতিঃ" (পাণিনি ৪।৪।৬০)।

সৃষ্টিকর্ত্তা হিসাবেও পরমেশ্বর মানিবার কোন হেতু নাই, কারণ পূর্বমীমাংসামতে সৃষ্টির আরম্ভ নাই। কোনও একদিন ইহা আরম্ভ হয় নাই এবং কোনও একদিনে ইহা শেষও হইবে না। ("সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ") সৃষ্টি-প্রবাহ অনাদি অনন্ত। সুতরাং সৃষ্টি-কর্ত্তা পালন-কর্ত্তা সংহার-কর্ত্তা কল্পনা করা নিরর্থক। বীজাঙ্কুরবৎ সৃষ্টিপ্রবাহ। ইহার আরম্ভ কল্পনাই অবান্তর। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে বীজ, সুতরাং আরম্ভ কোথায়? অনাদি এই প্রবাহ।

মাতা-পিতা হইতে সন্তান ইহা একটি অনাদিধারা। আদি পিতা-মাতার ধারণা একপ্রকার কল্পনা-বিলাস। এইরূপ ভাবনা অনেক সমস্যাসঙ্কুল। আদি মাতা-পিতা কে সৃষ্টি করিল, কেন সৃষ্টি করিল, পূর্ব্ব হইতে তাহাদের কোন কর্ম্মফল আছে কিনা, না থাকিলে কর্ম্মপ্রবৃত্তি আসিবে কোথা হইতে ইত্যাদি বহুবিধ প্রশ্নের সমাধানই অনাদি সৃষ্টি কল্পনা ভিন্ন হইতে পারে না।

জৈমিনি বেদ মানেন কিন্তু বেদের সকল কথা সমানভাবে মানেন না। তিনি বলেন, মন্ত্র-ব্রাহ্মণাত্মক বেদের দুইটি ভাগ—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ভাগে দুই রকমের বাক্য আছে। একপ্রকার বাক্য বিধি বা প্রেরণামূলক। আর একপ্রকার বাক্য কোন বস্তু বা তত্ত্ব স্থাপনমূলক। যেমন "স্বর্গকামো যজেত" স্বর্গ কামনা করিয়া যজ্ঞ করিবে। এই বাক্যটি প্রেরণামূলক বা বিধিবাক্য। আর "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তাই বাক্য ব্রহ্মতত্ত্ব স্থাপনমূলক। এতাদৃশ স্থাপন-মূলক বাক্য মূল্যহীন। ইহা

অনর্থক যদি না কোন কর্ম্মে প্রেরণার সঙ্গে ইহার যোগ থাকে। "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাম্" যাহা ক্রিয়ার্থক বিধিবাক্য নয় তাহা অনর্থক। ব্রহ্ম আছেন ইহাতে তোমার আমার বিশ্বজগতের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। ব্রহ্ম দ্বারা আমি কি করিব? যদি বলেন "ভর্গো দেবস্য ধীমহি" দেবতার জ্যোতি ধ্যান করিতে—তাহা হইলে বেদ আমাকে ধ্যানরূপ কর্ম্মে প্রেরণা দিলেন, এই বাক্য সার্থক প্রমাণ বটে।

বেদ মানুষকে ধর্মপথে চলিতে উপদেশ দিয়াছেন। ধর্ম্ম কি? ধর্ম্মের লক্ষণ—'চোদনা-লক্ষণো ধর্ম্ম।" যাহাতে চোদনা অর্থাৎ প্রেরণা আছে তাহাই ধর্ম্ম। বেদ যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহা করাই ধর্ম। বেদ যাহা করিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা করা অধর্ম্ম। বেদ যেখানে কোন বস্তুতত্ত্ব স্থাপন করিয়াছেন তাহা প্রেরণামূলক হইলে তাহার অনুষ্ঠানই ধর্ম। প্রেরণামূলক বাক্যই সার্থক। নতুবা অনর্থক।

ঈশ্বর আছেন এই বাক্য অনর্থক, যদি না আপনি তৎসম্বন্ধে কিছু করিবার নির্দ্দেশ দেন। বেদান্তাদি দর্শন এই তত্ত্ব লইয়া অকারণ মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছে। ঈশ্বর থাকিলে তিনিও তো কর্ম্মের অঙ্গীভূত। ব্যর্থ কথা লইয়া কেহ কোনদিন কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারে না। একমাত্র ধর্ম্মের উপর নিখিল বিশ্ব স্থিত আছে। বিশ্বসংসার একটি বিরাট কর্মপ্রবাহ। এই প্রবাহের সঙ্গে যথাযথভাবে যুক্ত হওয়াই ধর্ম। বেদে আছে বিধি ও নিষেধ। বেদ-বিধিমত চলাই ধর্ম্ম। না চলাই অধর্ম। কোন বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান প্রয়োজনহীন।

জীবনকে সুষ্ঠু ও কল্যাণময় করিবার জন্য ও মুক্তিলাভের জন্য একটি বস্তুরই প্রয়োজন। সেটি হইল ধর্ম্ম। ধর্ম্ম হইল বেদ-বিহিত কর্ম। বেদবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং বেদ-নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জন, ইহাই কর্ত্তব্য।

বৈদিক কর্ম্ম দুই প্রকার, নিত্যকর্ম্ম ও নৈমিত্তিককর্ম। সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্ম্ম। বিশেষ বিশেষ কারণে বিশেষ বিশেষ কালে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান নৈমিত্তিক কর্ম্ম। নিত্যকর্ম্ম করিলে মুক্তি হইবে। না করিলে প্রত্যবায় হইবে। প্রত্যবায় পাপ।

নৈমিত্তিক কর্ম্ম ফললাভার্থে করা হয়। ইহা অপরিহার্য নহে। না করিলে প্রত্যবায় হয় না। পাপ করিলে ফলে নরক ভোগ হইবে। ফলাফলের বিধান কর্ম্মই করিবে। কর্ম্মই শুভাশুভের, স্বর্গ নরকের নিয়ামক। সেজন্য ঈশ্বর-স্বীকারের কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। শুভকর্ম্মের অশুভ ফল, অশুভ কর্ম্মের শুভফল ঈশ্বরও দিতে পারেন না। সুতরাং কর্ম্মাধীন ঈশ্বরকে মানিয়া লাভ কি? ফলদানে কর্ম্মেই শক্তিমান্। "ফলং কর্মায়ত্তং কিমমরগণৈঃ কিং চ বিধিনা।"

জৈমিনি সূত্রকার, শবরস্বামী ভাষ্যকার। ভাষ্যকার-মতে মুক্তি অর্থে স্বর্গপ্রাপ্তি। পরবর্ত্তী কালে কুমারিল ভট্ট ও গুরু প্রভাকর মুক্তি অর্থে "সর্ব্বদুঃখ-নিবৃত্তি" বলিয়াছেন। কিন্তু মুক্তির অর্থ যাহাই হউক তাহা লাভ করিবার জন্য ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই, কর্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন। বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন। যজ্ঞ কর্ম্মাদির ফল দিবে মন্ত্র। মন্ত্রের

যথাযথ উচ্চারণে এবং আম্নায়-বিহিত কর্ম্মাদির যথাযথ অনুষ্ঠানে শুভফল অবশ্যম্ভাবী। মীমাংসাশাস্ত্র উপাসনা পূজা অর্চ্চনা মানিয়াছে কিন্তু ঈশ্বর মানে নাই। উপাসনাদির ফল দিবে মন্ত্র, নির্দ্দোষ উচ্চারণে ও অনুষ্ঠানে।

মীমাংসা-শাস্ত্র নীতি-শাস্ত্রের প্রভূত মূল্য দিয়াছে। প্রত্যেকটি কর্ম্ম নীতির বিধানমত হইবে। সংসারে সকল কর্ত্তব্য বা নীতির বিধান বেদশাস্ত্র দিয়াছেন ও বেদানুগ স্মৃতিশাস্ত্র দিয়াছেন। স্মৃতিশাস্ত্রকার সংখ্যায় একাধিক। যেখানে স্মৃতির বিধান ও বেদের বিধান পরস্পর-বিরোধী হইবে, সেখানে বেদের বিধানই গ্রাহ্য হইবে।

বেদেঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাম্।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মন স্তুষ্টিরেব চ॥ (মনু)

যে সকল স্থলে বেদ বা স্মৃতির প্রমাণ পাওয়া যাইবে না সে স্থলে সদাচার বা শিষ্টাচার প্রমাণ। বর্ত্তমানকালেও হিন্দু জাতির এক বিশাল অংশ স্মৃতিবিহিত ধর্ম ও নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

রামানুজ দর্শনে—আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব

রামানুজ বলেন, জীবাত্মা পরমাত্মার একটি "বিশেষ।" দ্রব্যের যেমন গুণ, বিশেষ্যের যেমন বিশেষণ ঠিক তেমনি পরব্রহ্মের বিশেষ জীবাত্মা। পরব্রহ্মের দুইটি বিশেষ, জীব ও জগৎ। জীব ও জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য। পরব্রহ্মের সত্যতা স্বয়ংসম্পূর্ণ—জীব ও জগতের সত্যতা পরব্রহ্মের উপর সর্বতোভাবে নির্ভরশীল। দুইটি বিশেষ, পরব্রহ্মের পূর্ণতার কোন হানি করে নাই।

জীব নিত্য, বুদ্ধিযুক্ত, চেতনাবিশিষ্ট। অন্যান্য জীব চৈতন্য-বিশিষ্ট, মানবাত্মা আত্মচৈতন্যযুক্ত। জীবাত্মা অণু, বিভু নহে। জীবাত্মা বহু, এক নহে। জীবাত্মা নিরংশ, অবয়বহীন।

অণু জীবের স্থান মানুষের হৃৎপদ্মে। অণু হইলেও সে জ্ঞানের বিস্তার দ্বারা দুঃখ সুখ ভোগ করে। ঘরের এক কোণের একটি প্রদীপ যেমন সমস্ত ঘরকে আলোকিত করে, অণু-জীবও তদ্রূপ সমস্ত দেহকে ও দেহের ভিতর আলোকিত করে।

তিন প্রকারের জীব—নিত্য, মুক্ত ও বদ্ধ। যাহারা চিরদিন বৈকুণ্ঠে আছেন, সর্বদা পরমানন্দে নিমগ্ন আছেন ও কর্ম্মবন্ধন, এবং প্রকৃতির বন্ধন-শূন্য, তাঁহারা নিত্য জীব। আগে বদ্ধ ছিলেন এখন তপস্যাদি দ্বারা-মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সত্য জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারা মুক্তির অধিকারী হইয়াছেন, এমন জীব হইলেন মুক্ত জীব। বদ্ধ জীব তাঁহারা, অজ্ঞতা ও স্বার্থপরতার অন্ধকারে নিমগ্ন হইয়া যাহারা সংসারচক্রে ঘুরিতেছেন। জীবের কর্মানুসারে প্রকৃতি

তাহাকে একটি দেহ দেন। দেহটা জীবাত্মার বাহন। এই বাহনের কাছে বদ্ধজীব আবদ্ধ। এই বন্ধনের জন্য সে ঈশ্বরের সন্নিধানে থাকিলেও তাঁহাকে জানিতে বা অনুভব করিতে পারে না।

জন্ম-মৃত্যুর প্রবাহ মধ্যে জীব বিচরণ করে। মৃত্যুতে তাহার নাশ হয় না। জীবাত্মা নিত্য, মহাপ্রলয়েও তাহার নাশ হয় না। নূতন সৃষ্টিতে আবার পূর্বের অবিনষ্ট কর্ম্মফলে সে নূতন দেহ লইয়া জীবন আরম্ভ করে। জীবাত্মার বৈশিষ্ট্য অহংবুদ্ধি। ইহা দ্বারা সে নিজের সত্তা রক্ষা করে। জীবাত্মা জ্ঞাতা ও কর্মী। বদ্ধজীব কর্ম্ম করে দেহেন্দ্রিয় দ্বারা। মুক্ত জীবের সংকল্প মাত্রেই কর্ম হয়। জীব ব্রহ্ম এক নহে। জীব ব্রহ্মের অংশ, বিশেষ রূপে অংশ। মুক্ত জীব ব্রহ্মে লীন হয় না, পার্ষদ রূপে নিত্যকাল বিরাজমান থাকে।

ভক্তের ভজনে পূজনে পূজোপহার-প্রদানে ভগবান্ তৃপ্ত হন। "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ" (গীতা ৯।২৬)। গীতার এই শ্লোকের ব্যাখ্যা রামানুজ এইরূপ করিয়াছেন—ভগবান্ বলিতেছেন, যদিও সর্ব্বদা আমার নিজের স্বরূপানন্দে অনন্ত সুখ-সমুদ্রে নিমজ্জমান থাকি, তথাপি ভক্ত যখন ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে আমাকে কিছু অর্পণ করে, তাহা ফল-জল হউক আর ফুল পাতা হউক—তখন আমি মনে করি আমার একটা পরম আদরের বস্তু ভক্ত আমাকে দিয়াছে, যাহা আমি চাহিতেছিলাম কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও পাইতেছিলাম না। তখন আমার সুখের সীমা থাকে না। পরমোল্লাসে আমি তাহা গ্রহণ করি, আহার করি (অশ্নামি)।

আচার্য্য শঙ্কর মতে সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত, এই ত্রিবিধ দ্বৈতরহিত পরব্রহ্মই পরমতত্ত্ব। তিনি নির্গুণ নির্বিশেষ নিরাকার। তিনি সর্ব্বময় সর্বব্যাপী নৈর্ব্যক্তিক সত্তা। তাঁহাতে ব্যক্তিত্ব (Personality) নাই। শঙ্করের এই ব্রহ্ম কিন্তু ঈশ্বর বা ভগবান্ নহেন, সৃষ্টি স্থিতি লয়ের কারণ নহেন, যেহেতু সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার মায়িক। ব্রহ্ম মায়াতীত। জীব আর ব্রহ্ম অভিন্ন। মায়াবশতঃ জীব নিজেকে পৃথক্ মনে করে। জ্ঞানোদয়ে মায়ার আবরণ কাটে, তখন সে জানিতে পারে যে সে ব্রহ্মই। ছান্দোগ্যশ্রুতির 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য এই কথাই বলিয়াছে।

সত্তা ত্রিবিধা, পারমার্থিকী, ব্যবহারিকী ও প্রাতিভাসিকী। ব্রহ্মের সত্তা পারমার্থিকী, জগৎপ্রপঞ্চের সত্তা ব্যবহারিকী, পারমার্থিকী নহে। কারণ ব্রহ্মসত্তার অতিরিক্ত সত্তা ইহার নাই 'তৎসত্তানতিরিক্ত-সত্তাক।' আবার রজ্জুতে যে সর্প-বুদ্ধি, সেখানে সর্পের সত্তা প্রাতিভাসিকী, কারণ ব্যবহার-দশাতেই তাহার বাধ হয়।

মায়োপাধিক ব্রহ্মই ঈশ্বর। তিনিই সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়ের কর্ত্তা। তাঁহার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—ইত্যাদি। ঈশ্বর সম্পূর্ণ সবিশেষ। তিনি কর্ম্মফল-দাতা।

শঙ্কর আবার অন্যরূপ বলেন সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা কর্ম্মফলদাতা একজন ঈশ্বর আছেন. ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে, কারণ ভগবান্ যদি পূর্ণতম হন তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টির কোন প্রয়োজনীয়তা থাকে না। যদি পূর্ণতম না হন তাহা হইলে অপূর্ণ ভগবানে

আর জীবে পার্থক্য থাকে না। শঙ্করের এই যুক্তি হইতে মনে হয় তিনি ঈশ্বর মানেন না। কিন্তু ইহা সত্য নহে।

শঙ্কর বলেন ঈশ্বরকে যুক্তি দ্বারা মানা যায় না। তবে ঈশ্বর মানি কেন? বেদ বলিয়াছেন, ঋষিরা বলিয়াছেন তাই মানি বেদবাক্য ও বিদ্বদনুভূতি, ঈশ্বর-সত্তার প্রমাণ। তিনি একমাত্র শ্রুতিগ্রাহ্য। এই কথাই ব্রহ্মসূত্র 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' ১।১।২, শাস্ত্র-যোনিত্বাৎ ১।১।৩—নির্দেশ করে।

নিরুপাধিক পরব্রহ্ম সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা নহেন। সোপাধিক মায়োপাধিক ব্রহ্ম ঈশ্বর। তিনি সৃষ্ট্যাদির কর্ত্তা। ব্রহ্ম মায়া দ্বারা উপাধি-বিশিষ্ট হন, তখন ঈশ্বর হইয়া সৃষ্ট্যাদি করেন।

বৈষ্ণবাচার্য্যেরা শঙ্করাচার্য্যের সঙ্গে একমত নহেন। তাঁহারা বলেন, ব্রহ্ম মায়াতীত। সুতরাং মায়া তাঁহাকে আবরণ করিতে পারে না। মায়োপাধি ব্রহ্ম ঈশ্বর, একথা কাল্পনিক। বৈষ্ণবাচার্য্যে-রাও মায়া মানেন। তাঁহারা বলেন মায়া দ্বারা উপাধিযুক্ত হয় জীব। জীব মায়ার আবরণে আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। শুধু জ্ঞান দ্বারা এই দুঃখ যায় না। একমাত্র ভক্তির উদয় হইলে ভক্তিযুক্ত জ্ঞানের ফলে মায়ার আবরণ কাটে। তখন সে ঈশ্বরের দাস, এই অনুভূতি জাগে। দাস-ভাবে সেবা দ্বারা তাহার দুঃখ দূর হয়। মুক্তিলাভ হয়। জীব ব্রহ্ম নহে। জীব মায়াবশ, ব্রহ্মমায়াতীত, মায়াধীশ—এই বিশাল ভেদ।

প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে শঙ্করের সঙ্গে বিচারমল্লতায় রামানুজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বলেন, ব্রহ্মে সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ নাই বটে কিন্তু স্বগত ভেদ বা স্বাশ্রয়ভেদ নিশ্চয়ই আছে।

ইহাতে শ্রুতির 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বা 'একরসম্' বাক্যের সার্থকতা হয়, বিরোধিতা হয় না। শঙ্করে ও রামানুজে এইখানে প্রধান অমিল। একটি গাভী ও অপর একটি গাভীতে যে ভেদ তাহা সজাতীয় ভেদ, একটা গাভী আর একটা মানুষে যে ভেদ তাহা বিজাতীয় ভেদ। একটা গাভীর হাত পা চক্ষু কর্ণের সহিত গাভীর যে ভেদ তাহা স্বগত বা স্বাশ্রয়ভেদ। শঙ্কর বলেন, ব্রহ্ম এই ত্রিবিধ ভেদশূন্য—কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন 'একমেপাদ্বিতীয়ম্' ও 'একরসম্।' একম্ এব অদ্বিতীয়ম্, এই একই কথা তিনবার বলায় ত্রিবিধ ভেদ নিবৃত্ত হইয়াছে। রামানুজ বলেন, স্বগত ভেদবিশিষ্ট ব্রহ্মই ঈশ্বর। তাঁহাতে দুইটি স্বগত ভেদ—জীব ও জগৎ চিৎ ও অচিৎ। চিজ্জড়বিশিষ্ট যে ব্রহ্ম তিনিই ঈশ্বর। ঈশ্বর আর ব্রহ্ম একই সত্তা। তিনিই পরমেশ্বর, তিনিই বিষ্ণু। ব্রহ্ম পারমার্থিক সত্য। মায়োপাধিক ব্রহ্ম ঈশ্বর, শঙ্করের এই সিদ্ধান্ত রামানুজ সর্বতোভাবেই খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলেন ঐ সব কথা মায়াবাদীদের কল্পনা মাত্র। ঈশ্বর সবিশেষ, চিৎ এবং জড় তাঁর দুইটি বিশেষ। ঈশ্বর সগুণ। তিনি অশেষ কল্যাণ গুণের খনি। তাঁহাতে গুণ নই অর্থে কোন অপগুণ নাই।

রামানুজ-মতে প্রত্যেকটি জীব ঈশ্বরেরই অভিব্যক্তি। তাঁহারই পরম চৈতন্যের অংশকলা। 'মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ' (গীতা ১৫।৭) এই কথা গীতাশাস্ত্র স্পষ্ট ভাষায় কহিয়াছেন। বিশ্বজগৎ ঈশ্বরের সৃষ্টি এই কথা বেদান্ত-সূত্র আরম্ভেই বলিয়াছেন—জন্মাদ্যস্য যতঃ (১।১।২)। বিশ্বের জন্ম স্থিতি ও লয় যাহা হইতে তিনিই ঈশ্বর, পরব্রহ্ম।

জীবের ব্যক্তিত্ব সসীম—সে ক্ষুদ্র। ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব অসীম তিনি ভূমা। ঈশ্বর উত্তম পুরুষ, পূর্ণ চৈতন্য। জীব অণু চৈতন্য অপূর্ণ, ক্ষুদ্র পুরুষ। ঈশ্বর সেব্য, জীব সেবক। শ্রীবিষ্ণুর সেবা দ্বারাই জীবের ক্ষুদ্র জীবনের পরিপূর্ণতা-প্রাপ্তি। জীব তাঁহার দিকে অগ্রসর হইবে সাধনা দ্বারা—তিনি জীবের দিকে অগ্রসর হইবেন কারুণ্যপ্রবাহে। নিজের সাধনায় ও ঈশ্বরের করুণায় জীবের ঈশ্বর-প্রাপ্তি। শঙ্কর বলেন, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। জীবের ঈশ্বর-প্রাপ্তি অর্থ, তৎসহ সাযুজ্যের অনুভূতি।

রামানুজ সাযুজ্য-মুক্ত মানেন না। তিনি বলেন, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, একথা বলিলে পাপ হয়। জীবের মুক্তি অর্থ সাযুজ্য নহে। সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য এই চারি প্রকার মুক্তি, যোগ্যতা ও লালসানুযায়ী জীব লাভ করে। জীব কখনও সাযুজ্য চাহে না। তাহা কখনও হইতেই পারে না। অণুচৈতন্য ব্রহ্মচৈতন্যে পৌঁছিলেও তাহার অণুত্বরূপ বৈশিষ্ট্য অনন্তকালই অক্ষুণ্ণ থাকে। বস্তুর যেমন বিশেষণ গুণ, বিশেষ্যের যেমন গুণপ্রকাশক বিশেষণ, সেইরূপ চিৎ ও অচিৎ, দুইটি বিশেষণ-রূপে ব্রহ্মকে বিশেষিত করে। ঈশ্বরের স্বরূপও চিজ্জড়াত্মক। জীব আমরা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে যুক্ত আছি। অজ্ঞানতাবশতঃ তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া ভুলিয়া যাই। তাই অশেষ প্রকার দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি। তাঁহার প্রতি উন্মুখ হইলেই তিনি অনন্ত-করুণা-বাহু প্রসারণ করিয়া জীবকে নিকটে টানিয়া লন। ঈশ্বর শুধু সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন। তিনি কৃপাময়, করুণাময়ও বটেন। করুণাশক্তি বলে তিনি জীবের অপরাধ

ক্ষমা করিয়া, নিজ লীলাধামে লইয়া যান, নিজ পার্ষদত্ব প্রদান করেন।

. বৈষ্ণবাচার্যগণ প্রায় সকলেই রামানুজের মত গ্রহণ করিয়াছেন অথবা তদনুরূপ ভাবনা করিয়াছেন, স্থলবিশেষে অল্পবিস্তর পরিবর্তন করিয়া। নিম্বার্কমতে জীবের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্বন্ধ ভেদাভেদ। মধ্বাচার্য্যমতে জীব ও ঈশ্বর সবদাই ভেদবিশিষ্ট। স্রষ্টা এবং সৃষ্ট কখনও এক হইতে পারে না। মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। শঙ্কর বলেন, 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য অনুসারে জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। বৈষ্ণবাচার্য্যেরা বলেন 'তত্ত্বমসি' বেদের একদেশ, মহাবাক্য নহে। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য মধ্বাচার্য্য বলেন, ব্রাহ্মণো রাজা সঞ্জাত ইতিবৎ।

শঙ্কর বলেন, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের সম্যক্ জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়। ভক্তি, সাধনের আনুষঙ্গিক মাত্র। বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে, শুদ্ধা ভক্তি দ্বারাই ঈশ্বরপ্রাপ্তি হয়—জ্ঞান সহায়ক-রূপে সঙ্গে থাকে মাত্র। ভক্তি পরাভক্তিতে উন্নীত হইলে জ্ঞান, ভক্তির বাধক হয়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামিপাদের মতে জীব-ঈশ্বরের সম্বন্ধ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ। অচিন্ত্য-অর্থে কেবল চিন্তার অতীত নহে, চিন্তারাজ্যের অতীত। তবে রসের রাজ্যে ভেদাভেদ সম্ভব। জীব তাঁহার অংশ বলিয়া ভেদবিশিষ্ট, কিন্তু রসের অনুভূতিতে ভালোবাসায় তাঁহার সঙ্গে একাত্মতা অনুভূত হয়। শ্রীকৃষ্ণ রসিকশেখর, অনন্ত রসের সিন্ধু। জীবের সঙ্গে তাঁহার রসের সম্বন্ধ হয়। তিনি পুত্র হন, সখা হন, প্রাণবল্লভ হন। যখন

প্রাণবল্লভ হন, তখন জীবের তাঁহার সঙ্গে অভিন্ন-মননে একাত্মতা হয়।

লৌকিকে যে প্রকার পতিপত্নীর গভীর মিলনে প্রায় একাত্মতার অনুভূতি হয়, আবার পতি-সেবার জন্য পত্নীর পৃথকত্ব বোধও জাগে—অপ্রকৃত লীলারসের আস্বাদনেও সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের একাত্মতা অভিন্নতা অনুভূত হয়, আবার শ্রীকৃষ্ণ সেবার জন্য পৃথকত্বের ভাবনাও জাগে। এই একত্ব ও পৃথকত্ব, অচিন্ত্যভাবে মিলিত হইয়াছে। ইহাকেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বলা হয়।

শ্রীজীব বলেন, ভক্তি গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া জ্ঞানশূন্যা হইলে শুদ্ধ ভক্তিতে পরিণত হয়। শুদ্ধ ভক্তি, গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রেমভক্তি হয়। প্রেমভক্তি গাঢ়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া যখন প্রণয় ভূমিতে উপনীত হয়, তখন শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ভক্তের অভিন্ন মনন হয়। এই সকল অপরোক্ষ অনুভূতিবেদ্য। বিচার-ভূমিকায় ইহার অবস্থিতি নাই। 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ'—এইটি হইল শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ। তিনি রসিকেন্দ্রচূড়ামণি।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ শুধু দার্শনিক সিদ্ধান্ত নহে। ইহা শ্রীগৌরসুন্দরের জীবনলীলায় মূর্ত্তিমন্ত হইয়াছে। এই দার্শনিক সিদ্ধান্তের মূর্ত্তরূপ (embodiment) হইলেন শ্রীগৌরাঙ্গচন্দ্র।

রাধা অর্থে আরাধিকা। কৃষ্ণ আরাধ্য। আরাধ্য আরাধিকা এক অঙ্গে দ্রবীভূত হইয়া শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব। দুই অভিন্ন বলিয়া ইহা সম্ভব হইয়াছে। শ্রীমতী যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিশিয়া একীভূত হইয়া যাইতেছেন তখন সখী ললিতা তাঁহাকে স্পর্শ

করেন। বলেন—"সখি। এপথে মিলিত হলে পরমানন্দ হবে বটে, কিন্তু পৃথক্ থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরূপ-দর্শন, চরণ-সেবন সর্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন হবে কী করে?" শ্রীমতী তখন নিবৃত্ত হইলেন, আর মিশিলেন না। যেটুকু মেশা বাকী ছিল, সেটুকু হইলেন গদাধর।

এই সিদ্ধান্তটি শ্রীশ্রীপ্রভু জগবন্ধুসুন্দরের। তাঁহার শ্রীলেখনী-নিঃসৃত উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

"একদিন কৃষ্ণচন্দ্র পণ রাখিয়া নৃত্য আরম্ভ করিলেন। শ্রীমতীর জয় হইল। দেখিয়া শ্যামসুন্দর শ্রীমতীর জয়ে অত্যন্ত গর্ব্বিত হইয়া আনন্দে রাধাময় হওতঃ প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়িতেই শ্রীমতী বাহু পসারিয়া প্রাণকান্তকে বুকে আবরণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্রীমতী—রাধাময় শ্রীকৃষ্ণে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকে গৌরাঙ্গ করিলেন। গৌরাঙ্গ অবতারের ইহাই সূচনা। ললিতা দাঁড়াইয়াছিলেন। যেই দেখিলেন শ্রীকৃষ্ণ অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর ভাবে একেবারেই মিলিয়া যাইতেছেন, তখন দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী দ্বারা স্পর্শ করিলেন। যে অংশটুকু মিলিতে বাকী ছিল তাহাই গদাধর হইয়াছেন। এইজন্যই গদাধরকে শ্রীরাধা বলা হয়।"

যে অংশটুকু মিলিতে বাকী ছিল তাহাই "গদাধর", শ্রীশ্রীপ্রভুর এই উক্তি একটা বাগ্‌ভঙ্গী মাত্র। অখণ্ড তত্ত্ব রাধারাণীর ভাগ হয় না। অংশ হয় না। তিনি পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে মিলিতা হইয়াও পূর্ণরূপেই গদাধরে আছেন। পূর্ণ হইতে পূর্ণ

গেলেও পূর্ণ ই অবশেষ থাকে। "পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।" চিন্ময় বস্তুর এই স্বভাব।

তবে যে শ্রীশ্রীপ্রভু "যে অংশটুকু বাকী রহিল" এইরূপ বাগ্‌ভঙ্গী করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীরাধার আস্বাদনের যাহা বাকি রহিল, তাহাই গদাধর হইয়াছেন। একাঙ্গে মিলিত হইয়াও পৃথক্ থাকিয়া আস্বাদনের সাধ যায় না। তাহা বাকীই থাকে। গৌর-অঙ্গে রাধাকৃষ্ণের একাঙ্গে আস্বাদন। গৌর-গদাধরে রাধা-কৃষ্ণের পৃথক্ থাকার আস্বাদন। গদাধরের অঙ্গে গৌরহরি সে নিভৃত কুঞ্জের আলিঙ্গনের অনাস্বাদিত সুখটি গাঢ় হইতে গাঢ়তরভাবে আস্বাদন করেন। "যে অংশটুকু বাকী" কথাটির ইহাই গূঢ় তাৎপর্য্য।

শ্রীরাধা অখণ্ড বস্তু। তিনি দুই খণ্ড হইলেন না। মিলিত হইবার বাঞ্ছাও পূর্ণ হইল, অমিলিত থাকিয়া সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলনের শাশ্বত বাঞ্ছাও পূর্ণ হইল। এইটি চিন্তার রাজ্যের অতীত। রসের রাজ্যেই এইরূপ সম্ভব হইল। ইহাই অচিন্ত্য ভেদাভেদ।